কবিতার কী ও কেন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতার কী ও কেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KABITAR KEE O KENO
by Nirendranath Chakravarti
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 30.00

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা

জানুয়ারি ১৯৮২

চতুর্থ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

দাম : ৩০ টাকা

ISBN 81-7079-503-6

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ সংস্থাপনা : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অম্লানের জন্য

লেখকের অন্যান্য বই

নীল নির্জন
অন্ধকার বারান্দা
প্রথম নায়ক
নীরক্ত করবী
নক্ষত্র জয়ের জন্য
কলকাতার যিশু
উলঙ্গ রাজা
খোলা মুঠি
কবিতার বদলে কবিতা
আজ সকালে
পাগলা ঘণ্টি
ঘর-দুয়ার
রূপ-কাহিনী
সময় বড় কম
যাবতীয় ভালবাসাবাসি
ঘুমিয়ে পড়ার আগে
জঙ্গলে এক উন্মাদিনী
আয় রঙ্গ
চল্লিশের দিনগুলি
সন্ধ্যারাতের কবিতা
শ্রেষ্ঠ কবিতা
কবিতা সমগ্র (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পিতৃপুরুষ
কবিতার ক্লাস
সমাজ-সংসার
কবিতার দিকে
নীরবিন্দু

সাদা বাঘ
বিবির জন্য
বারো মাসের ছড়া
ও কলকাতা
ডাইনোসর
গঙ্গা-যমুনা
শুরুর থেকে শুরু

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালার (১৯৭৫) সংকলন এই গ্রন্থ। বক্তৃতাগুলিকে—যার বিষয় ছিল কবিতা—গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বক্তৃতাগুলিকে তৈরি করে তুলবার সময়ে দরকারি নানা বইপত্রের জোগান দিয়ে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ রইলুম।

বক্তৃতার দিনগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করেছিলুম, তার স্মৃতি এখনও আমাকে উন্মনা করে।

কাব্যজিজ্ঞাসুদের কৌতূহল এই গ্রন্থপাঠে যদি ঈষণ্মাত্রও তৃপ্ত হয়, তা হলে সেটাই হবে আমার পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১ জানুয়ারি, ১৯৮২

সূ চি প ত্র

কবিতা কী

ধরা যাক, আমরা শিকার করতে বেরিয়েছি। ধরা যাক, আমরা একটি সিংহ শিকার করব। কিন্তু যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সিংহ সেখানে সত্যি-সত্যি আছে তো? কীভাবে বুঝব যে, সে আছে? ধরা যাক, একটু আগেই আমরা তার গর্জন শুনেছি। কিংবা নরম মাটিতে দেখেছি তার পায়ের ছাপ। সেই শোনা কিংবা সেই দেখার উপরে নির্ভর করে আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দূরের একটা ঝোপ যেন একটু নড়ে উঠল। সিংহ? চকিতে একটা ছায়া যেন আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। সিংহ? আমাদের প্রত্যেকেরই স্নায়ু একেবারে টান-টান হয়ে আছে। হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে মুখের মধ্যে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বুকের ধক্‌ধক্ খুব স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, আর দেরি নেই, এইবারে হয়তো যে-কোনও মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ধরা যাক, ঠিক এইভাবেই একটি কবিতার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। আমরা শুনেছি যে, কবিতা কিছু অসম্ভব শশবিষাণের ব্যাপার নয়, কবিতা বলে সত্যিই কিছু আছে, এবং আমাদের ধারেকাছেই আছে। তাই আমরা আশা করছি যে, আমাদের অন্বেষণ বিফলে যাবে না, যে-কোনও মুহূর্তে আমরা তার দেখা পাব।

কিন্তু দেখা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, দেখা যখন হবে, তখন তাকে চিনে নিতে পারব তো? প্রশ্নটা আমাদের নয়, বিদেশি এক কবি-সমালোচকের। কিন্তু আর্চিবল্ড ম্যাক্‌লিশ যখন এই প্রশ্ন তোলেন, তখন তাঁর সমস্যাটা যে কী, তা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি। আসলে, সিংহ কিংবা বাঘ কিংবা টেবিল কিংবা চেয়ার কিংবা কলম কিংবা বই কিংবা এই রকমের আরও অজস্র প্রাণী অথবা বস্তুকে যত সহজে চিনে নেওয়া যায়, কবিতাকে চিনে নেওয়া তত সহজ ব্যাপার নয়।

কেন নয়? ম্যাকলিশ এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ইতিপূর্বে আমরা যদি

সিংহ না-ও দেখে থাকি, তবু যে তাকে দেখবামাত্র আমরা চিনে নিতে পারি, তার কারণ আর কিছু নয়, নানাজনের কাছে এই প্রাণীটির যে বর্ণনা আমরা শুনেছি, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। গল্পের অন্ধেরা যখন হাতির বর্ণনা দিয়েছিল, তখন তাদের একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে সাপের মতো ; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে কুলোর মতো ; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে থামের মতো; আর যে-অন্ধটি হাতির শুঁড়, কান বা পা ছোঁয়নি, শুধু—হাতি যখন তার পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন—আন্দোলিত বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা খেয়েছিল মাত্র, সে বলেছিল যে, হাতি হচ্ছে একটা ঝড়ের মতো ব্যাপার। কিন্তু তেমন কোনও বিভ্রাট এক্ষেত্রে ঘটছে না। সিংহের বর্ণনা যাঁরা দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তাঁরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের দেওয়া সেই বর্ণনার উপরে নির্ভর করেই সিংহকে শনাক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে, কবিতা নামক ব্যাপারটাকে যে তেমন করে আমরা শনাক্ত করতে পারি না, তার কারণ, তার বিষয়ে যে-সব বর্ণনা আমরা পেয়েছি, অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব বর্ণনার মধ্যে কোনও মিল নেই। এমন-কী, প্রায়শ তারা পরস্পরের বিরোধী। রামের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে শ্যামের বর্ণনা মেলে না। যদুর বর্ণনা ও মধুর বর্ণনার মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। নবীনের দেওয়া বর্ণনায় আবার রাম শ্যাম যদু ও মধু, প্রত্যেকেরই আপত্তি ঘটে। ফলে, তাকে শনাক্ত করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুই মহাজন যার বর্ণনায় একমত হতে পারেন না, কীভাবে তাকে আমরা খুঁজে ফিরব? এবং দেখা হয়ে গেলেই বা কীভাবে, কোন্ কোন্ লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নেব তাকে?

সর্বসম্মত কোনও বর্ণনা কিংবা সংজ্ঞা না-পাবার যে অসুবিধা, কবিতার আলোচক মাত্রেই কখনও-না-কখনও তার সম্মুখীন হন। তখন কীভাবে তাকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেন তাঁরা? তাঁদের কেউ-বা কোনও পূর্বাচার্যের দেওয়া সংজ্ঞাকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে অতঃপর তারই আলোয় চিনবার চেষ্টা করেন যে, কোন্‌টা কবিতা আর কোন্‌টা নয়। কেউ-বা সেক্ষেত্রে, কোনও পূর্বাচার্যের সংজ্ঞাকে একেবারে পুরোপুরি হয়তো মেনে নেন না, কিন্তু তারই সূত্র ধরে চেষ্টা করেন অন্য-কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণের। আবার কেউ-বা, অন্য-কারও সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী না-হয়ে, একান্তভাবে অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে, অন্য পথে এগিয়ে যেতে চান। চেষ্টা করেন, পূর্বলব্ধ যাবতীয় সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কহীন, কোনও নূতন সংজ্ঞা খুঁজে নিতে। কিন্তু সেই নূতন সংজ্ঞা যখন খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা নিয়েও আবার নূতন করে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। কাকে কবিতা বলে, এই প্রারম্ভিক প্রশ্নেরই কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ ও লক্ষণ নির্ণয়ের এই যে নব-নব প্রয়াস, এবং তার থেকে সঞ্জাত এই যে বিরোধ, এই নিয়েই আমরা এখানে প্রশ্ন তুলতে পারি। বলতে পারি যে, নূতন করে আবার এতসব বাদ-বিসংবাদের মধ্যে জড়িয়ে যাবার দরকার নেই, তার চেয়ে বরং প্রাচীন মতামতগুলির দিকেই আর-একবার চোখ ফেরানো যাক। দেখা যাক, তা-ই দিয়েই আমাদের প্রয়োজন মেটে কি না। অর্থাৎ তারই উপরে নির্ভর করে আমরা বুঝে নিতে পারি কি না যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা আসলে কী।

মুশকিল এই যে, কবিতা-সংক্রান্ত আমাদের এই জিজ্ঞাসা সেখানেও কোনও চূড়ান্ত উত্তর খুঁজে পায় না। বিসংবাদের ক্ষেত্রটি বস্তুত সেখানেও বেশ বড় মাপের। বামনাচার্য যখন বলেন, কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ, তখন প্রতিবাদীরা বলেন, তা কেন হবে, অলংকৃত বাক্যমাত্রেই কিছু কাব্যের মর্যাদা পেতে পারে না ; উপরন্তু, বাক্যবন্ধ নিরলংকার হলেই যে তা কাব্য বলে গ্রাহ্য হবে না, এমনও নয়। বস্তুত, কাকে আমরা অলংকার বলব, এবং কাকে নয়, বিরোধ ঘটে তা নিয়েও। বিশ্বনাথ অবশ্য অলংকৃত বাক্যবন্ধের উপরে জোর দেন না, গুরুত্ব আরোপ করেন রসের উপরে। কিন্তু, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, এই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাটিও যে আমাদের চূড়ান্ত সন্তোষ উৎপাদন করে না, তার কারণ, সেক্ষেত্রে আমরা আবার নূতন জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে যাই। কাব্যজিজ্ঞাসাকে মুলতুবি রেখে তখন আবার সন্ধান করতে হয় যে, রস কাকে বলে।

আনন্দবর্ধন সম্পর্কে, আরও অনেক কথার মতো, এই কথাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যের ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি একেবারেই বিপরীত বিন্দু থেকে অগ্রসর হয়েছেন। কাব্য কী, তা জানাবার জন্যই তিনি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কাকে আমরা কাব্য বলতে পারি না। আমরা যাকে 'এলিমিনেশন পদ্ধতি' বলি, বস্তুত তারই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি ; এবং বলছেন যে, যে-বাক্যবন্ধ থেকে নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই আমাদের লভ্য নয়, কাব্য বলে গণ্য হবার কোনও যোগ্যতাই তার নেই।

ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? মোটামুটি এই দাঁড়াল যে, বাক্য যখন কাব্য বলে গণ্য হতে চায়, তখন তার মধ্যে নিতান্ত শব্দার্থের অতিরিক্ত কোনও অর্থের কিংবা তাৎপর্যের আভাস থাকা চাই। এই যে তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থ, এরই প্রসঙ্গে আসবে ব্যঞ্জনার কথা। কিন্তু তার আগে একবার পাশ্চাত্যের কাব্যতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া যাক, এবং দেখা যাক যে, কাব্যবিচারের কোনও সহজ সূত্র সেখানে মেলে কি না।

আরিস্টটলের কথাই ধরা যাক। কাব্য বিষয়ে তাঁর অতিবিখ্যাত যে প্রস্তাবের কথা সবাই জানেন, এবং গিলবার্ট মারের সিদ্ধান্ত[১] মেনে নিলে যে-প্রস্তাবকে আমরা কবিতা নামক ব্যাপারটার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করতে পারি, সেখানে কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসার কোনও জবাব মেলে না। কবিতাকে সেখানে হরেক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন আরিস্টটল, এবং বর্ণনা করেছেন তাদের ইতিহাস ও লক্ষণাবলী, কিন্তু কবিতা বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে তা তিনি নির্দেশ করেননি।

কবিতার জন্মরহস্য সম্পর্কে অবশ্য তিনি নীরব নন। রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় আছে, "পুরাকালে সরস্বতী পুত্র কামনা করিয়া হিমালয়পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সন্তুষ্ট মনে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—'আমি তোমার পুত্র সৃষ্টি করিতেছি।' তাহার পর সরস্বতী কাব্যপুরুষকে প্রসব করিলেন।"[২] আরিস্টটল কিন্তু তেমন কোনও দৈব উৎসের উল্লেখ করেন না। বরং বেশ স্পষ্ট করেই তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে, কবিতা আসলে বাস্তব জীবন কিংবা ঘটনারই এক ধরনের অনুকৃতি মাত্র। তাঁর বক্তব্য, "মানুষ হচ্ছে অনুকরণপ্রিয় প্রাণী, সে সবকিছুকে অনুকরণ করে দেখাতে পারে, যা কিনা অন্যান্য প্রাণী পারে না," এবং তার এই অনুকরণস্পৃহা থেকেই জন্ম নিয়েছে কবিতা।

বলা বাহুল্য, আরিস্টটলের এই উক্তি আমাদের ভাবায়, কিন্তু আমাদের কৌতূহল শুধু এইটুকু জেনে তৃপ্ত হয় না। তার কারণ, গ্রিক দার্শনিকের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবার দরুন ইতিমধ্যে আমরা এও জেনেছি যে, শুধু কবিতা নয়, সর্বরকমের সুকুমার শিল্পই হচ্ছে বাস্তবের অনুকরণ। অর্থাৎ কোনও শিল্পকেই মৌল কোনও রচনা বলে গণ্য করা চলে না, সবই আসলে মূলের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, চিত্রকলার সঙ্গে কবিতার তবে আর পার্থক্য কোথায়, কিংবা কিসের উপরে ভিত্তি করে তা হলে ভাস্কর্য কিংবা সংগীত থেকে কবিতাকে আমরা আলাদা করে চিনে নেব?

আরিস্টটল যে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি, তা অবশ্য নয় ; তিনি আমাদের বলেই দিচ্ছেন যে, সব শিল্পই যদিও বাস্তব অথবা সত্যের অনুকৃতি

১. "...it looks as if his [Aristotle's] treatise on poetry was an answer to Plato's challenge." (আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের ইনগ্রাম বাইওয়াটারকৃত অনুবাদের ভূমিকা।)

২. 'রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা'। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মাত্র, তবু বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যম, বিষয় ও রীতি বা পদ্ধতি তো এক নয়, সেক্ষেত্রে তারা পরস্পর থেকে পৃথক। বস্তুত, মাধ্যম, বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা থেকেই বিভিন্ন শিল্পকে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি।

কোনও শিল্পকে পৃথকভাবে শনাক্ত করবার এই যে উপায়, এরই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে চিত্র ভাস্কর্য কিংবা সংগীতকলা থেকে কবিতাকে একেবারে আলাদা করে চিনে নেবার একটি সহজ সূত্র। চিত্রের মাধ্যম যদি রং ও রেখা, ভাস্কর্যের মাধ্যম যদি ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ড এবং সংগীতের মাধ্যম যদি ধ্বনি, কবিতার মাধ্যম তা হলে শব্দ। কবিতা কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তবে আর চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলবার দরকার কী? খুব সহজেই তো এখন তা হলে আমরা বলতে পারি যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ। মুশকিল এই যে, কেউ-কেউ শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন না, আরও খানিকটা এগিয়ে যান। তাঁদের বক্তব্য, শব্দকে এক্ষেত্রে শুধু 'মাধ্যম' বলাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে আরও বড়। যার ভিতর দিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ পাচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, কবিতাটিরও কোনও অস্তিত্ব তা হলে থাকে না। সেই বিচারে আমাদের বলতে হয় যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ, এবং শব্দই হচ্ছে কবিতা।

তা কি আমরা বলতে পারি? না, পারি না। কেন পারি না, একটু বাদেই সে-কথায় আবার আসা যাবে। তার আগে বলা দরকার যে, কাব্যজিজ্ঞাসার এই সহজ সমাধানকেও অনেকে একেবারে অগ্রাহ্য করছেন না। এবং তাঁদেরই মধ্যে একজন, চার্লস হুইলার, আমাদের জানাচ্ছেন যে, যে-সমাধান সবচেয়ে সরল, স্রেফ ওই সারল্যের জন্যেই অনেক ক্ষেত্রে সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।[৩] প্রসঙ্গত তিনি এডগার অ্যালান পো'র সেই গল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যে একখানা চোরাই চিঠিকে আসামি যেখানে পুলিশের একেবারে চোখের সামনেই ফেলে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, চোখের সামনে ছিল বলেই পুলিশ সেটা দেখতে পায়নি, কিংবা দেখতে পেলেও গুরুত্ব দেয়নি, হরেক গোপন জায়গায় তারা সেই চিঠির জন্য গলদ্‌ঘর্ম তল্লাশ চালিয়েছে। শুধু পো'র ওই একটি গল্প কেন, এমন আরও অনেক রহস্যকাহিনী আমরা পড়েছি, লেখক যেখানে পাঠকের সামনে একটি সহজ সমাধান ঝুলিয়ে রেখে দেন, অথচ সহজ বলেই পাঠক সেটাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, তার নজর স্বতই চলে যায় সম্ভাব্য আরও হরেক সমাধানের দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে

৩. 'The Design of Poetry.' Charles B. Wheeler.

বোকা বনতে হয়, কেননা শেষ পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়ে দেন যে, ওই সহজ সমাধানটিই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। কিন্তু সে-কথা থাক। দরকারি কথাটা হচ্ছে এই যে, কবিতা-বিষয়ক এই সহজ সমাধানটিকে হুইলারও আসলে তাঁর আলোচনাকে এগিয়ে নেবার সুবিধার জন্য গ্রাহ্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনিও একে চূড়ান্ত সমাধান বলে মানেননি।

মানছি না, বলা বাহুল্য, আমরাও। কেননা, আমাদের চিত্তে ইতিমধ্যে অন্য-একটি জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। কবিতা অবশ্যই শব্দ। কিন্তু নিতান্ত সেই কারণেই কি শব্দকে আমরা কবিতা বলে গ্রাহ্য করব? যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত শব্দকে? তা হলে তো যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত রঙ ও রেখাকে চিত্র বলে, যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ডকে ভাস্কর্য বলে এবং যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত ধ্বনিকে সংগীত বলে আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু তা তো আমরা করি না। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যে আবার আর-এক দিক থেকেও এই সমস্যাটিকে আমরা দেখতে শুরু করেছি। আমরা ভাবছি যে, শুধু কবিতা কেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার—উপন্যাসের, গল্পের কি নাটকের— মাধ্যমও তো শব্দই। শুধু মাধ্যম নয়, তার চেয়ে বেশি-কিছু। কেননা, সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যার মাধ্যমে সেগুলি রচিত হচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, উপন্যাস, গল্প কি নাটকেরও কোনও পৃথক অস্তিত্ব তা হলে থাকে না। সুতরাং শব্দ আর কবিতাকে যদি আমরা তুল্যমূল্য বলে মনে করি, তবে শব্দ আর উপন্যাস, শব্দ আর গল্প, কিংবা শব্দ আর নাটককেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করতে হয়। এবং তা যদি আমরা করি, অবস্থাটা তা হলে এই রকম দাঁড়ায় :

কবিতা হয় শব্দ
শব্দ হয় উপন্যাস,
(সুতরাং) কবিতা হয় উপন্যাস।

অর্থাৎ, ব্যাপারটা একেবারে যৎপরোনাস্তি হাস্যকর হয়ে ওঠে।

তা হলে আমরা কী বুঝব? আমরা কি এটাই বুঝব যে, এক্ষেত্রে যে প্রেমিস অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্যের সোপান বেয়ে আমরা সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছিলুম, তারই মধ্যে একটা ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল, এবং সেই ভ্রান্ত আশ্রয়বাক্যই একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছে? বলা বাহুল্য, তা-ই আমাদের বুঝতে হবে! আমাদের ধরেই নিতে হবে যে, শব্দ যদিও কবিতার মাধ্যম, এমন-কী কবিতার অস্তিত্ব যদিও শব্দের অস্তিত্বের উপরে

একান্তভাবে নির্ভরশীল, তবু কবিতা ও শব্দকে তুল্যমূল্য কিংবা সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না!

কোনও কালেরই কোনও কবি কিংবা সমালোচক যে তা করেছেন, তাও নয়। কবিতার আলোচনায় এই অভিমত তবে প্রাধান্য পেয়েছিল কেন যে, পোয়ট্রি ইজ ওয়র্ডস? প্রাধান্য যাঁরা দিয়েছিলেন, কবিতাকে যে তাঁরা মুখ্যত একটি ভাষা-শিল্প বলে গণ্য করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নিতান্ত ভাষা-শিল্প না-ভেবে, কবিতাকে যাঁরা বিশেষ এক ধরনের ভাষার শিল্প বলে মনে করতেন, প্রতিপত্তি তাঁদেরও কিছু কম ছিল না। তাঁরা এমনও ভাবতেন যে, কবিতা হচ্ছে এমনই সুকুমার একটি শিল্প, যা তার উপাদান হিসেবে শুধু সুকুমার শব্দই দাবি করে। সমস্ত শব্দই যে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য, এবং, যোগ্যজনের হাতে পড়লে, কোনও শব্দকেই যে কবিতার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশকারীর মতো অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, এই উদার ধারণা তাঁদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। 'পোয়েটিক ডিকশন' বলে যে ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত, তার প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের অত্যধিক আসক্তির কথা আমরা শুনেছি। সেইসঙ্গে জেনেছি যে, শেক্সপিয়রের রচিত একটি সংলাপ কেন পরবর্তী কালের একজন বিখ্যাত সমালোচকের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ম্যাকবেথের উক্তির মধ্যে 'নাইফ' শব্দটা ডঃ স্যামুয়েল জনসনের পছন্দ হয়নি ; বস্তুত তাঁর এমনও মনে হয়েছিল যে, ওই শব্দটা থাকার ফলে গোটা সংলাপটাই একেবারে ঝুলে গেছে। মনে হবার কারণ আর কিছুই নয়, 'নাইফ' নামক অস্ত্রটি কসাই ও পাচকেরা ব্যবহার করে থাকে, এবং—ডঃ জনসনের বিবেচনায়—এই 'ইতরজনসংসর্গের' ফলে তার শুচিতা নষ্ট হয়েছে, সুতরাং কবিতায় তার উল্লেখ নিষেধ। শেক্সপিয়ারের কপাল ভাল, ডঃ জনসনের পাল্লায় তাঁকে পড়তে হয়নি, স্বদেশীয় সাহিত্যের শব্দরুচি অত্যধিক সভ্যভব্য হয়ে উঠবার অনেক আগেই তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

কাব্যিক শব্দের প্রতি এই যে পক্ষপাত, এটা কিন্তু একান্তভাবেই অষ্টাদশ শতকের ব্যাপার নয়, কিংবা বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্যেরও ব্যাপার নয়। এই সেদিনও বাংলা কাব্যসাহিত্যের যা ছিল প্রধান স্রোতোধারা, এবং মুখ্যত যা ছিল রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে উৎসারিত, গত শতাব্দীর অন্ত্য অধ্যায় ও এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে তার মধ্যেও এই একই পক্ষপাত আমরা দেখতে পাই। আমরা লক্ষ করি যে, সাধারণ মানুষরা তাদের কথাবার্তায় যে-

সব শব্দ প্রায়শ ব্যবহার করে থাকে, সেই আটপৌরে শব্দগুলি সেখানে বিশেষ প্রশ্রয় পায় না, এবং সাধারণ মানুষদের নিত্যব্যবহার্য নানা সাংসারিক জিনিসপত্র সম্পর্কেও সেই কবিতা বড় বিস্ময়করভাবে নীরব থাকে।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি টমাস গ্রে বলেছিলেন, কবিতা কখনও তার সমকালীন ভাষায় রচিত হয় না। গ্রের এই উক্তিকেই বাংলা কবিতা পরবর্তী শতকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই। তবে, উনিশ শতকের অন্ত্য অধ্যায় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি যিনি ছিলেন বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ, সেই রবীন্দ্রনাথের, অন্যবিধ সাহিত্যকর্মে না হোক, কবিতায়—এমন-কী, এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে রচিত কবিতায়—যে-শব্দরুচির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাতে আমরা বুঝতে পারি যে, কবি হিসেবে তিনিও ছিলেন 'কাব্যিক' শব্দের পক্ষপাতী। তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলিতেও এই সত্যটা গোপন থাকেনি। সেখানে তিনি দাবি করছেন বটে, "আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই,"[৪] কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন, "বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন বলে সামলে নিতে হয়।"[৫] শুনে কি গ্রের কথাটাই মনে পড়ে না? আবার যখন শুনি, "বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়োফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে,"[৬] তখন সেই জনসনের কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, কসাই ও পাচকের সংসর্গদোষ নাইফ শব্দটার জাত মেরে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সেই পর্যায়ে রচিত তাঁর কবিতায় কোথাও আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেননি, কিংবা নামোল্লেখ করেননি আমাদের নিত্যব্যবহার্য বস্তুসামগ্রীর, তা অবশ্য নয়। এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে গত শতকের অন্ত্য দশকে রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার[৭] কথা, যেখানে 'হাঁড়ি' 'সরা' থেকে শুরু করে 'গুড়ের পাটালি' আর 'ঝুনা নারিকেল' পর্যন্ত এমন সমস্ত শব্দের উল্লেখ ঘটেছে, হেঁশেল আর উদরের সঙ্গে যাদের 'সংসর্গদোষের' কথা আমরা সবাই জানি। উপরন্তু সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমাও। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা লক্ষ না-করে পারি না যে, এই জাত-যাওয়া বস্তুসামগ্রীর নাম আর আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমা আসছে কবিতাটির শুধু সেই অংশেই, যেখানে তিনি

৪. ৫. ৬. সাহিত্যধর্ম। 'সাহিত্যের পথে'।
৭. যেতে নাহি দিব (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। 'সোনার তরী'।

একটু রঙ্গরসের লঘু আবহ গড়ে তুলতে চান। আমরা বুঝতে পারি, আটপৌরে শব্দ আর আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমা সেখানে তাঁর কৌতুকের উপকরণ মাত্র। তার বেশি মর্যাদা তিনি তখনও তাদের দিচ্ছেন না। এমন-কী, তার অনেক বছর পরে লেখা, এবং প্রায় একই রকমের বিখ্যাত, আর-একটি কবিতাতেও[৮] না। সেখানে রুগ্‌ণা নারীটি যখন বলে, "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা/বাইশ বছর এক চাকাতে বাঁধা", তখন সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে কত অনায়াসেই তো নিত্যব্যবহার্য নানা তৈজসপত্রের উল্লেখ ঘটতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ঘটতে দেন না, হেঁশেলের আভাসমাত্র দিয়েই তাঁকে—তাঁরই ভাষায় বলি—"সামলে নিতে হয়।" অথচ ও-সব জিনিসের উল্লেখ ঘটলে কবিতাটির বেদনার দিকটা যে কিছুমাত্র চাপা পড়ত, এমন কথা বিশ্বাস করবার কোনও যুক্তি নেই।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইংরেজি সাহিত্যের হঠাৎ-ভব্য-হয়ে-ওঠা পরিবেশের মধ্যে স্যামুয়েল জনসন যখন 'অকাব্যিক' শব্দের দিকে তাঁর নিষেধের তর্জনী তুলে ধরছিলেন, টমাস গ্রে যখন সমকালীন ভাষা থেকে কবিতার ভাষাকে একেবারে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিচ্ছিলেন,[৯] এবং অলিভার গোল্ডস্মিথ যখন তাঁর এই প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টায় ছিলেন যে, সব শব্দ নয়, প্রতিটি ভাষাতেই আসলে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য আলাদা এমন-কিছু শব্দ রয়েছে, যা আমাদের কল্পনাকে দীপিত করে ও কর্ণকে আরাম দেয়,[১০] তখন অন্যদিকে ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে উঠছিল বিদ্রোহের পটভূমি। আমরা জানি যে, এর কিছুদিন বাদেই আবির্ভাব ঘটবে ওয়র্ডসওয়র্থের। জানি যে, পোশাকি শব্দকে নির্বাসনে পাঠাবার আহ্বান জানাবেন তিনি। বলবেন যে, শুধু সেই ভাষাতেই কবিতা লেখা উচিত, যা কিনা মানুষের নিত্যব্যবহার্য মুখের ভাষা।[১১]

৮. মুক্তি (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। 'পলাতকা'।

৯. "The language of the age is never the language of poetry." Thomas Gray.

১০. "There are certain words in every language particularly adapted to the poetical expression ; some from the image or idea they convey to the imagination ; and some from the effect they have upon the ear." Oliver Goldsmith.

১১. "...the real language of men." W. Wordsworth.

বলা বাহুল্য, ঝোঁকটা এক্ষেত্রে বিপরীত বিন্দুতে পড়ছে বটে, কিন্তু এও আসলে চরম পন্থাই, এক ধরনের শব্দকে যা সমূহ গ্রহণ করতে বলে ও অন্য ধরনের শব্দকে যা সমূহ বর্জন করতে শেখায়। বুঝতে চায় না যে, কবিতার উপাদান হিসেবে সমস্ত শব্দই গ্রাহ্য, কিন্তু নির্বিচারে কোনও শব্দই গ্রাহ্য নয়। আসলে, কোনও কবিতার মধ্যে কোনও শব্দকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলে মনে হবে কি না, সেটা একেবারে সর্বতোভাবেই নির্ভর করছে শব্দগুলিকে যিনি ব্যবহার করেন, তাঁর যোগ্যতার উপরে। বস্তুত, কোনও কবিতার মধ্যে কোনও শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ যখন আড়ষ্ট, অপ্রতিভ ও অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং কবিতাটিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করে না, তখন এটাই আমাদের বুঝতে হবে যে, শব্দ-নির্বাচনে—অন্তত সেই কবিতাটিকে নির্মাণ করে তুলবার সময়ে—তিনি যথেষ্ট রকমের যোগ্যতা দেখাতে পারেননি।

আটপৌরে-শব্দ-সংবলিত কথ্য ভাষায় কবিতা লিখবেন, ওয়র্ডসওয়র্থের এই প্রতিজ্ঞায় তাঁর সমসাময়িক অন্য-এক বিশিষ্ট কবির, কোলরিজের, কিছুমাত্র সায় ছিল না। তার কারণ, 'কাব্যিক শব্দসুষমা'র প্রতি তাঁরও আস্থা ছিল আত্যন্তিক। আপন প্রত্যয়ের সপক্ষে সেদিন অতিশয় জোরালো রকমের তর্কও তিনি চালিয়েছেন। পরবর্তী কালের সাহিত্য-আলোচনার উপরে সেই তর্কবিতর্কের ছায়া যখন বারে বারে সঞ্চারিত হচ্ছিল, তখন, তারই মধ্যে, সার ওয়ালটার রলির মুখে আমরা এমন একটা কথা শুনতে পেলুম, যা কিনা একটা মীমাংসা-সূত্রের আভাস এনে দেয়। কবিতার আলোচনায় শব্দের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা তিনি অস্বীকার করলেন না, কিন্তু একই সঙ্গে বললেন যে, ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের গুরুত্বও কিছু কম নয়।[১২]

সম্ভবত আরও বেশি। রলি অবশ্য তাঁর স্বদেশীয় কবিতার শব্দবিন্যাসের কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজি কবিতা নয়, সমস্ত ভাষার কবিতা সম্পর্কেই এ-কথা প্রযোজ্য। শব্দের সুষ্ঠু বিন্যাস আসলে কবিতামাত্রকেই সেই সামর্থ্য জোগায়, যা থাকলে তবেই একটি কবিতা, কিংবা তার একটি অংশ, সবচেয়ে জোরালোভাবে আমাদের চিত্তে এসে আঘাত করে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ছন্দের দিক থেকে যে পঙ্‌ক্তিটিকে বিচার করে দেখেছিলেন

১২. 'Wordsworth'. Sir Walter Raleigh.

রবীন্দ্রনাথ,[১৩] এবং বলেছিলেন যে, "ছন্দের ঝংকারের মধ্যে" দুলিয়ে দেবার ফলেই এই পঙ্‌ক্তিটি এমন একটা স্পন্দন পেয়ে যাচ্ছে, যা "কোনো দিনই শান্ত হবে না", সেই "কেবা শুনাইল শ্যামনাম"কে আরও কত ভাবে আমরা সাজিয়ে নিতে পারি, নীচে সেটা দেখানো হল :

(ক) শুনাইল কেবা শ্যামনাম
(খ) শ্যামনাম কেবা শুনাইল
(গ) কেবা শ্যামনাম শুনাইল
(ঘ) শ্যামনাম শুনাইল কেবা
(ঙ) শুনাইল শ্যামনাম কেবা

বলা বাহুল্য, মূল পঙ্‌ক্তিটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে এভাবে সাজিয়ে নিলেও তার অর্থ একই থাকে, এবং ছন্দের যেটা মূল কাঠামো, তারও কোনও হানি হয় না। কিন্তু নবতর এই বিন্যাসগুলি ঠিক ততটাই জোর পায় না, পঙ্‌ক্তিটির মূল বিন্যাসের মধ্যে যতটা জোর আমরা লক্ষ করি। মূল বিন্যাসকে সেদিক থেকে 'ধ্রুব বিন্যাস' বলতে হয়। ধ্রুব এই অর্থে যে, তার আর কোনও নড়াচড়া হবার উপায় নেই।

একটু বাদেই এই বিন্যাসের প্রসঙ্গে আমাদের ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেটা এই যে, শব্দকে প্রাধান্য দেবার এই যে প্রবণতা, এরই সমান্তরালভাবে আর-একটি প্রবণতাও যে ভিন্নতর একটি সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছে, তাও আমরা লক্ষ না-করে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে, একদিকে যখন শব্দ ও ভাষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তখন অন্যদিকে, ভাষার উপরে আসন দেওয়া হচ্ছে ভাবনাকে। শেলির 'এ ডিফেন্‌স অব পোয়ট্রি' খুব স্পষ্ট করেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, কবিতার যা কিনা সারাৎসার, ভাষার মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেন না শব্দকে তা অতিক্রম করে যায়। শৃঙ্খলা (অর্ডার), সৌন্দর্য (বিউটি) ও সত্যের (ট্রুথ) সঙ্গে তার তুলনা টেনেছেন শেলি। বলছেন, শব্দ দিয়ে যা আমরা বানিয়ে তুলি, শুধু সেইটুকুর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

শেলির এই বক্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কবিতার শরীর ও কাব্য-ভাবনাকে শেলি আসলে পৃথক করে দেখতে চাইছেন। নিতান্ত শব্দের মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, আমরা যখন তারই উপরে নিবদ্ধ করছি

১৩. 'ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের আগ্রহ, তখন তার দিক থেকে আমাদের চিন্তাকে তিনি ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন সেই ভাবনার দিকে, ঠাণ্ডা ও কঠিন গুটিকয় শব্দের মধ্যে যার অনেকটা অংশই ধরা পড়েনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, কবির ভাবনার যে-অংশকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে ধরিয়ে দিতে পারেননি, আমাদেরই কি তা ধর্তব্য? সত্যি বলতে কী, তাও যদি আমাদের ধর্তব্য হয়, কবিতা নিয়ে তা হলে আর বিতণ্ডার অন্ত থাকে না। প্রেম ভালবাসা বিদ্বেষ বিরহ যুদ্ধ রক্তপাত কিংবা এই রকমের যে-কোনও বিষয় নিয়ে নিতান্ত দায়সারা গোছের গুটি চার-ছয় লাইন লিখেও তো যে-কোনও কবি সেক্ষেত্রে অক্লেশে আমাদের বলতে পারেন যে, ওই চার-ছয় লাইনের মধ্যে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে যেন কবিতাটিকে আমরা বিচার করতে না যাই, কেননা, ওর মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, তার চেয়ে অনেক বড় করে, অনেক গভীর করে, অনেক নিবিড় করে ওই বিষয়টিকে তিনি ভেবেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিল্পী মাত্রেই তা-ই ভেবে থাকেন, এবং কোনও শিল্পীই তাঁর ভাবনাকে একেবারে সর্বাংশে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিম্বিত করে দেখাতে পারেন না। কবি পারেন না, চিত্রকর পারেন না, ভাস্কর পারেন না। ভাবনা ও রূপের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য সর্বক্ষেত্রে থেকেই যায়। শুধু কবি বলে কথা নেই, তৃপ্তিহীনতা তাই শিল্পী মাত্রেরই নিয়তি।

অন্যান্য শিল্পের কথা থাক। কবিতার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কবির ভাবনার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হবার কোনও উপায় যদি আমাদের থাকত, তা হলে তো— স্থূলভাবে দেখতে গেলে—কবিতা পড়বার কোনও দরকারই আমাদের হত না। কিন্তু তেমন কোনও উপায় আমাদের নেই। ফলে, তাঁর ভাবনার যেটা ব্যক্ত অথবা বাস্তব রূপ, শব্দ-রূপ, তারই সাহায্য নিতে হয় আমাদের। এবং খুশি থাকতে হয় কবির ভাবনার শুধু সেইটুকুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যেটুকু তাঁর কবিতার মধ্যে বিম্বিত বা আভাসিত হয়েছে। কীভাবে বিম্বিত বা আভাসিত হয়েছে, শুধু সেইটুকুই আমাদের বিচার্য। যখন আমরা কবিতা পড়ি, তখন আমরা কবিতা-ই পড়ি ; ভাবনার ওই শব্দ-রূপ ছাড়া আর কিছুই তখন আমাদের বিচার্য নয়।

কিন্তু ওই শব্দ-রূপের ভিতর দিয়েই যে শব্দাতীতের আভাস পেয়ে যাই আমরা, তা-ই বা কী করে অস্বীকার করি? বস্তুত, গদ্যের সঙ্গে কবিতার এখানেই মস্ত পার্থক্য। গদ্যও এক ধরনের শব্দ-রূপই, আমাদের ভাবনাকে সেও মূর্তি দেয়, কিন্তু শব্দ সেখানে তার তাৎক্ষণিক বা আভিধানিক অর্থের বেশি-কিছু আমাদের বলে না। কবিতার শব্দ সেক্ষেত্রে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে

যেতে চায়, ছাড়িয়ে প্রায়শ যায়ও, ইঙ্গিত করতে থাকে অন্যতর কোনও অর্থ কিংবা তাৎপর্যের দিকে।

এই যে তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া, একেই আমরা বলি ব্যঞ্জনা, আর এই ব্যঞ্জনাকেই আমরা কাব্যের একটি ধ্রুব অভিজ্ঞান বলে গণ্য করতে পারি।

প্রশ্ন উঠবে, শব্দ কীভাবে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যায়। উত্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তার একক শক্তিতে সেটা সম্ভব হয় না। প্রতিটি শব্দেরই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, এবং, বাক্যের ভিতর থেকে সরিয়ে এনে, শব্দগুলিকে যখন আমরা পৃথক-পৃথকভাবে দেখি, তখন সেই সুনির্দিষ্ট অর্থের আশ্রয়েই তাদের নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। পক্ষান্তরে, বাক্যের ভিতরে প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে তাদের নিশ্চলতার অবসান ঘটে, তাও নয়। ঘটে একমাত্র তখনই, ঠিকমতো-নির্বাচিত দুই বা ততোধিক শব্দ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ায়। এই যে পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়ানো, একে আমরা 'বিদ্যুন্ময়' সান্নিধ্য বলতে পারি। আমরা লক্ষ করি যে, এই সান্নিধ্য অর্জিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দের সেই অর্থগত নিশ্চলতার অবসান ঘটেছে, তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এবং পরস্পরের সহযোগে তারা তাদের ধরাবাঁধা অর্থকে অতিক্রম করে অন্যতর কোনও অর্থ অথবা তাৎপর্যকে আভাসিত করতে চাইছে। অর্থাৎ, অর্থের বিচারে, যা ছিল নেহাতই একমাত্রিক বা 'ওয়ান-ডাইমেনশনাল' ব্যাপার, সহসা সে একটি বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যখন পড়ি :

হে হংসবলাকা,
'ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত' তোমাদের পাখা
রাশি রাশি 'আনন্দের অট্টহাসে'
'বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া' চলিল আকাশে।...[১৪]

অথবা জীবনানন্দের কবিতায়

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক 'বিপন্ন বিস্ময়'
আমাদের 'অন্তর্গত রক্তের' ভিতরে
খেলা করে...[১৫]

১৪. বলাকা। 'বলাকা'।

১৫. আট বছর আগের একদিন। 'মহাপৃথিবী'।

তখনই আমরা শব্দের সেই বিদ্যুন্ময় সান্নিধ্যের ক্রিয়াফল উপলব্ধি করতে পারি। একটু আগে আমরা যে ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের কথা শুনেছিলুম, এইখানেই তার গুরুত্ব।

কিন্তু সঠিক বিন্যাস থেকে জাত এই যে ক্রিয়াফল,—ধরাবাঁধা অর্থের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এবং অন্যতর অর্থকে আভাসিত করবার জন্য শব্দের এই যে চঞ্চলতা, শুধু কবিতার মধ্যেই যে একে আমরা দেখতে পাই, তাও নয়। দেখতে পাই অনেক গদ্যরচনার মধ্যেও। তখন আমরা বলি যে, সেই গদ্যরচনা—অন্তত সেই রচনার সেই অংশটুকু—যেন কবিতা হয়ে উঠেছে।

কবিতা কী, এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা হলে এখন আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আসলে শব্দ নয়, বরং শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণপনা। ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। (উদ্ধৃত দুই কবিতাংশে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা দুই বা ততোধিক শব্দ যেমন দিয়েছে।) অথবা বলতে পারি, কবিতা আসলে ভাষার একটি স্তর, কবিতা বলে গণ্য হতে হলে আমাদের ভাবনার শব্দ-রূপকে যে-স্তরে উত্তীর্ণ হতে হবেই ; আবার, অন্যদিকে, গদ্যরচনাও যে-স্তরকে মাঝেমাঝে স্পর্শ করে যায়।

কবিতা কেন

সত্যিই তো, কেন?

আমাদের চতুর্দিকে অহোরাত্রি যে অসংখ্যা রকমের কর্মকাণ্ড চলেছে, এবং যার উপরে নির্ভর করছে আমাদের বৈষয়িক ভাল-মন্দ, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে যদি কবিতা রচনা ও পাঠের ব্যাপারটাকে কার্যকারণের সূত্রে যুক্ত করে দেখানো যেত, এবং যদি বলা যেত যে, কিছু লোক কবিতা লেখেন ও কিছু লোক কবিতা পড়েন বলেই এত-সব কাজ অবাধে চলতে পারছে, নইলে এসব কাজের চাকা কবেই অচল হয়ে পড়ত, তা হলে আর কথাই ছিল না, একেবারে নিশ্চিত হয়ে সেক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারতুম যে, এই তো, এরই জন্যে কবিতা।

কিন্তু সেইসব কর্মকাণ্ডের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার ঠিক তেমন কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। রাতারাতি জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ধাপে ধাপে লাফিয়ে উঠছে অভ্রংলিহ অট্টালিকা, বিশাল বনস্পতিকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে বুলডোজার, কারখানার চিমনি গিয়ে মেঘের বালিশে মাথা রাখছে, নদীর গর্ভ থেকে উঠে আসছে মস্ত-মস্ত পিলার, তার উপরে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের সড়ক, চায়ের পেটি কিংবা আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে হাইওয়ে কাঁপিয়ে ট্রাক ছুটছে, জাহাজের উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে গম, তেল, যন্ত্রপাতি কিংবা নিউজপ্রিন্ট, মাটির তলায় পাতা হচ্ছে রেলের লাইন, রানওয়ে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাচ্ছে এরোপ্লেন,—এই যে এত-সব বৃহৎ ঘটনা, এর প্রত্যেকটিকে নিয়েই কবিতা লেখা যায় বটে, কিন্তু কবিতাকে এর একটিরও হেতু হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। অর্থাৎ, এক কথায়, এসব কাজের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার কোনও কার্যকারণের সম্পর্ক নেই। এমন-কী, নিতান্ত জীবিকার্জনের জন্য ন্যূনতম যেটুকু উদ্যোগ আমাদের না-থাকলেই নয়, তার সঙ্গেও না। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কেউ কখনও কবিতা লিখতে বসেনি।

জীবিকার্জনের উদ্যোগের সঙ্গে কবিতার এই যে সম্পর্কহীনতা, রবীন্দ্রবর্ণিত কবি-গৃহিণী একেবারে সরাসরি এর দিকে আঙুল তুলেছেন। ভদ্রমহিলার উক্তি

খুবই স্পষ্ট। স্বামীর উদ্দেশে তিনি যখন বলেন :

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম ;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।[১]

তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে একমত হই। আমরা বুঝতে পারি যে, এই গঞ্জনা একটা মস্ত বড় অভিমান থেকে উঠে আসছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা তাই বলে মিথ্যে নয়।

প্লেটো অবশ্য অন্য দিক থেকে তাঁর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। 'রিপাবলিক'-এর দশম গ্রন্থে কবিতার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, (ক) এমন সমস্ত বস্তুকে সে অনুকরণ করে দেখায়, যারা নিজেরাই অনুকরণ বা প্রতিচ্ছবিমাত্র ; উপরন্তু (খ) আমাদের হীন ও দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে সে উশকে দেয়, এবং বশবর্তী হতে শেখায় এমন সমস্ত আবেগ-বাসনার, যেগুলিকে দমন করা দরকার।[২]

এই ধরনের আপত্তি যে এ-দেশে কখনও ওঠেনি, তাও নয়। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় যেসব আপত্তির উল্লেখ করেছেন, তা হল এই যে, (ক) কাব্যে মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা থাকে, (খ) অসৎ বা গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ থাকে, এবং (গ) অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা থাকে।[৩] (সুতরাং তার অধ্যয়ন বা আলোচনা অনুচিত।) রাজশেখর অবশ্য এসব আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু সে-কথা আবার পরে আসবে। আপাতত প্লেটোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

কবিতাকে প্লেটো যে কেন 'ছায়ার অনুকৃতি' বা 'অনুকরণের অনুকরণ' বলে গণ্য করেন, তা আমরা জানি। বস্তুত, শুধু কবিতা কেন, যাবতীয় শিল্পকর্মই তাঁর কাছে 'অনুকরণের অনুকরণ' মাত্র, তার বেশি মর্যাদা তিনি তাদের দেন না। কেন

১. পুরস্কার। 'সোনার তরী'।

২. "...Poetry, the false Siren, the imitator of things which themselves are shadows, the ally of all that is low and weak in the soul against that which is high and strong, who makes us feed the things we ought to starve and serve the things we ought to rule..." আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব'-এর ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত তর্জমার ভূমিকা। গিলবার্ট মারে।

৩. 'রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা'। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

দেন না, 'রিপাবলিক'-এ নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে, জাগতিক যেসব বস্তু আমাদের চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই পিছনে রয়েছে সেই বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, এবং সেই ধারণাই হচ্ছে মূল সত্তা, বস্তু যার অনুকরণ মাত্র। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ছুতোর-মিস্ত্রি যে টেবিল বানাচ্ছেন, সেই টেবিলও আসলে টেবিল-সংক্রান্ত ধারণা বা টেবিলের মূল সত্তার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত, কোনও শিল্পী যখন সেই টেবিলটিকে এঁকে দেখান, তখন সেটা অনুকরণের অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো বলছেন, বস্তুত মূল সত্তার স্রষ্টা হচ্ছেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর যদি স্বয়ং একটা টেবিল বানাতেন, তা হলে তাঁর বানানো সেই টেবিল একটি মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু, যেজন্যেই হোক, তা তিনি বানাননি। টেবিল বানিয়েছেন সূত্রধর, এবং শিল্পী সেই টেবিলের ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর টেবিল অতএব টেবিলের মূল সত্তা থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে রয়েছে।[৪]

ঠিক ততটাই দূরে রয়েছে কবিতাও। যেমন শিল্পীর ছবি, তেমন হোমারের কাব্যও অনুকরণের অনুকরণ, অর্থাৎ মূল সত্তা থেকে অনেক দূরবর্তী ব্যাপার। প্লেটো অন্তত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। তাঁর যুক্তি : কবিদের দৃষ্টি মূল সত্যের প্রতি নিবদ্ধ নয়, তাঁরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবিটিকেই শুধু দেখেন। এমন-কী, সেই প্রতিচ্ছবিটিরও নির্মাতা তাঁরা নন। তাঁরা শুধু সেই প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি রচনা করেন। তাঁরা না-যোদ্ধা, না-জনসেবী, না-চিকিৎসক, না-পণ্ডিত। হোমারের কাব্যে যেসব বৃহৎ কর্মের বর্ণনা আমরা পাই, তিনি নিজে তার নায়ক নন। 'রিপাবলিক'-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, হোমারের কালের এমন কোনও যুদ্ধের কথা কি কেউ জানে, যে-যুদ্ধের সাফল্য তাঁর নেতৃত্বে অথবা পরামর্শে অর্জিত হয়েছিল? মানুষের উপকার হয়, এমন কোনও বাস্তব কৌশলের কি তিনি উদ্ভাবক? কিংবা এমন কোনও শিক্ষাকেন্দ্র কি তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণের জন্য যেখানে সমবেত হত? এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই উত্তর হচ্ছে 'না'। অর্থাৎ, অন্যে পরে কা কথা, হোমারের মতো মহাকবিও নিজে কিছু ঘটান না, অথবা নিজে কিছু করেন না। অন্যের দ্বারা

৪. "...the work of the artist is at the third remove from the essential nature of the thing..." প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর এফ. এম. কর্নফোর্ড-কৃত তর্জমা।

আয়োজিত ঘটনার অথবা অন্যের কৃত কর্মের বর্ণনা দেন মাত্র।[৫]

তা-ই যদি হয়, তা হলে আমরা কবিতা পড়ব কেন? মূল সত্তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেন আমাদের আগ্রহকে সংহত করব সেই রচনার উপরে যা আসলে ছায়ার ছায়ামাত্র? প্লেটো বলছেন, সত্যিই তা করা উচিত নয়। বলছেন, শুধু হোমার কেন, সত্য সম্পর্কে কোনও কবিরই কোনও যথার্থ জ্ঞান নেই। সুতরাং কবিতার উপরে আমাদের আগ্রহকে তো আমরা সংহত করবই না, বরং মানবজীবনে কাব্যের প্রভাব যে কত অনিষ্টকর, অন্যদেরও তা জানিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য, অন্যদের জানিয়ে দেবার ব্যাপারে প্লেটোর উদ্যোগে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁর চেতাবনি সত্ত্বেও যে কবিতা রচনা ও পাঠের আগ্রহ এতাবৎকাল অব্যাহত থেকেছে, তা আমরা জানি। জানি যে, প্লেটো তাঁর কল্পরাজ্য থেকে কবিতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের কল্পনাকে দীপিত করবার ব্যাপারে তার ভূমিকার কোনও অবসান তবু ঘটেনি, মানুষের চিত্তভূমিতে তার আসন চিরকাল অটুটই ছিল। উপরন্তু আমরা এও জানি যে, কবিতার প্রতি প্লেটো নিজেও কিছু কম আসক্ত ছিলেন না। বস্তুত, 'রিপাবলিক'-এর ওই দশম গ্রন্থেই হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথাটা তিনি অকপট ব্যক্ত করেছেন।

প্লেটো তা হলে আর কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন কেন? উত্তরটা আমরা প্লেটোর মুখেই শুনেছি। তিনি সত্যসন্ধ দার্শনিক ; তাঁর দৃষ্টি সর্বোপরি সত্যের দিকে নিবদ্ধ। এবং কবিতা যেহেতু সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাই—হোমারের রচনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভালবাসা

৫. হোমার যে কবিমাত্র, আর কিছু নন, এত জোর দিয়ে এ-কথা বলবার হেতু নাকি এই যে, বিশেষভাবে হোমারকে ও সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের সেই সময়ে—সফিস্ট ও হোমার-আবৃত্তিকারদের পক্ষ থেকে—সর্ব-গুণান্বিত মানুষ হিসেবে প্রচার করা হত। বলা হত, তাঁরা পদ্মভুক মানুষ নন, মালবাহী শকট নির্মাণ ও রথচালনা থেকে শুরু করে সমরকৌশল-নির্ধারণ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্যা তাঁদের অধিগত ; উপরন্তু নীতি ও ধর্মের ব্যাপারেও 'সর্বসাধারণ'কে তাঁরা সঠিক পন্থার নির্দেশ দিতে সক্ষম। প্লেটো বস্তুত এই দাবিটাকেই অসার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন ; যে-দাবি কবিকে দার্শনিকের আসনে বসায়, এবং দর্শনচর্চার পরিবর্তে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করে মানুষকে, তা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। (প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর কর্নফোর্ড-কৃত তর্জমায় দশম গ্রন্থের সূচনায় সন্নিবেশিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

সত্ত্বেও—এই শিল্পকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি স্থান দিতে পারেন না। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, আবেগনির্ভর কবিতাকে তিনি যুক্তিনির্ভর দর্শনের বিরোধী একটি শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। কবিতা সম্পর্কে তাঁর অন্যবিধ আপত্তি, বলা বাহুল্য, এই মৌল আপত্তির সূত্র ধরেই এসেছে।

কিন্তু কবিতা কি সত্যিই সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়? নাকি সে তার নিজস্ব পথে পৌঁছতে চায় দ্বিতীয় কোনও সত্যের ক্ষেত্রে, যাকে আমরা শিল্পের নিজস্ব সত্য বলে গণ্য করতে পারি? এই যে প্রশ্ন, এর উত্তর খুঁজে নেবার প্রয়াসে আমরা প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের কাছ থেকে সাহায্য পাব, যাঁর কাব্যবিষয়ক প্রস্তাবকে অনেকে—আমরা আগেই বলেছি—কবিতার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করে থাকেন।

যেমন অন্যবিধ শিল্পকে, তেমনি কাব্যকেও আরিস্টটল যে অনুকরণ বলে মনে করতেন, কিন্তু অনুকরণের অনুকরণ নয়, তার কারণ, বস্তু-জগৎ তাঁর কাছে নিতান্ত ছায়ামাত্র ছিল না, তাকে তিনি সত্য বলে মানতেন। ফলত, বস্তুজগৎকে যা অনুকরণ করে দেখায়, সেই কাব্যকে তিনি কখনও সত্য থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থিত ব্যাপার বলে মনে করেননি। কাব্যবিচারে গুরুশিষ্যের মতামতে আর-একটি পার্থক্যও আমরা লক্ষ না-করে পারি না। আমাদের চিত্তের উপরে কাব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে গুরু ও শিষ্য দু'জনেই অবহিত ছিলেন ; কিন্তু, তাঁর গুরুর মতো, আরিস্টটল কখনও এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, কাব্যের কাজ হচ্ছে নেহাতই আমাদের দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে উশকে দেওয়া। বরং তাঁর কাব্যবিষয়ক প্রস্তাবে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলছেন যে, কাব্যের আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে গিয়ে সাড়া জাগায়। শুধু তা-ই নয়, কাব্য যে দর্শনবিরহিত ব্যাপার, এমন কথাও তিনি মানলেন না। ইতিহাস ও কাব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে বরং জানালেন যে, ইতিহাসের চেয়ে কাব্য আরও দার্শনিক ও তার তাৎপর্য আরও দূরপ্রসারী, কারণ, কাব্য যেক্ষেত্রে সর্বজনীন সত্যের কথা বলে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কথা শোনায় মাত্র।[৬]

কাব্যের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাকে আমল

৬. "...poetry is something more philosophic and of greater import than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars." আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব'-এর ইনগ্রাম বাইওয়াটারকৃত তর্জমা।

দেননি আরিস্টটল। বলেছেন, কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে চলবে না ; দেখতে হবে, কথাটা কে বলছে অথবা কাজটা কার। সেই সঙ্গে দেখতে হবে যে, সেই উক্তি অথবা আচরণের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিই বা কে।...উক্তি অথবা আচরণের উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় কী, সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরা চাই। ভেবে দেখতে হবে যে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, অথবা বৃহত্তর অমঙ্গলকে এড়াবার জন্য, কথাটা বলা হচ্ছে কি না অথবা কাজটা করা হচ্ছে কি না।[৭]

এই যে কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্ন করে না-দেখে, উদ্দেশ্য তাৎপর্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা, সাহিত্যবিচারে এই পদ্ধতির মূল্য যে কতটা, তা আমরা জানি। কিন্তু শুধু এই পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না আরিস্টটল, এই সঙ্গে তিনি আরও একটা কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কাব্যবিচারের ব্যাপারে যা কিনা আরও জরুরি। ইতিপূর্বে তিনি আমাদের বলেছেন যে, কাব্য কীভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সত্যকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্যের ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। এবারে তারই সূত্র ধরে তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন। কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা নির্ভুল, তার বিচারের প্রসঙ্গে এসে বললেন, কাব্যশিল্প ও অন্যবিধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি এক নয়, সুতরাং তাদের (বিচার করবার) মানদণ্ডও হবে আলাদা।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটোর কাছে আমরা শুনেছিলুম যে, কবিতা কেন নয়। এবারে আরিস্টটলের কাছে পাল্টা উত্তর শোনা গেল। শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্লেটোর অভিমতকে অবশ্য অন্যভাবেও খণ্ডন করা যায়। তাঁর কাছে আমরা তিন রকমের টেবিলের কথা শুনেছি। ঈশ্বরের টেবিল (অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা), ছুতোর-মিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিল। আরও শুনেছি যে, ছুতোরমিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিলকে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা যায় না। কেননা, টেবিলের মূল সত্তা থেকে তারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের

৭. কবিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রাজশেখরও পরবর্তীকালে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। কাব্যের অন্তর্ভুক্ত যে উপদেশ বা আলোচনাকে সমালোচকেরা অনৈতিক (অসৎ বা গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত) মনে করেন, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে রাজশেখরও তুলেছিলেন উদ্দেশ্যের কথা। বলেছিলেন, "এমন উপদেশ অথবা আলোচনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার তাৎপর্য নিষেধমুখী, বিধিমুখী নয়।"

দূরত্বে অবস্থান করছে। দ্বিতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণ ও তৃতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণের অনুকরণ। এই যে তিন রকমের টেবিল, এদের মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা বা ঈশ্বরের টেবিলকেই প্লেটো সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনটি টেবিলের উপযোগিতাও তিন রকমের। ঈশ্বরের টেবিল বা টেবিল সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ধারণা ব্যতিরেকে সূত্রধরের টেবিল নির্মিত হতে পারত না, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায় যে, সেই বিশুদ্ধ ধারণার উপরে কি আমরা ভাতের থালা রাখতে পারি? তা আমরা পারি না। তার জন্য সূত্রধরের টেবিলই আমাদের চাই। আবার সূত্রধরের টেবিল আমাদের নান্দনিক ক্ষুধা মেটায় না। সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য চাই চিত্রকরের আঁকা টেবিল। অর্থাৎ প্লেটো যাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুকরণের অনুকরণ' বলছেন, উপযোগিতার বিচারে গুরুত্ব তাদেরও কিছু কম নয়।

প্লেটোর আপত্তিকে, বলাই বাহুল্য, সেদিক থেকে বিচার করেননি আরিস্টটল। কিন্তু নানাবিধ শিল্পকর্মের প্রেরণা ও শ্রেণী-বিভাজন[৮] সম্পর্কে সাধারণভাবে নানা কথা বলে নিয়ে অতঃপর বিশেষভাবে কবিতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর যুক্তিজাল, যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন এই শিল্পের ধ্রুব ভূমিকার দিকে, ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যচিন্তাকে যে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল, আরিস্টটলের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে—খ্রিষ্টীয় ষোড়শ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে—রচিত কবিতা-বিষয়ক দুটি অতিবিখ্যাত নিবন্ধ তা আমাদের জানিয়ে দেয়। সেখানে, সেই নিবন্ধ দুটির উপরে, আরিস্টটলীয় কাব্যভাবনার ছায়াকে আমরা বারে-বারে সঞ্চারিত হতে দেখি। বলা বাহুল্য, আমরা সিডনির 'অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়ট্রি' এবং শেলির 'এ ডিফেন্স অব পোয়ট্রি'র কথা বলছি, পরে যাকে আমরা সংক্ষেপে শুধুই 'অ্যাপলজি' ও ডিফেন্স' বলে উল্লেখ

৮. আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' যে কাব্যের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্য সম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, তা নয়, তবে অধিকতর উৎসাহ দেখায় নানাবিধ কাব্যের শ্রেণী, কুল ইত্যাদির পরিচয় নির্দেশে। অর্থাৎ, তত্ত্বের তুলনায়, তথ্যের উপরেই সেখানে বেশি জোর পড়ে ; 'কাব্যতত্ত্ব'-এর আলোচনা, সেদিক থেকে, মূলত বহিরঙ্গভিত্তিক। 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় (গ্রন্থ-পরিচিতি) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, "...গ্রিক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়।" এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য আলাদা করে আরিস্টটলের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই মন্তব্য যখন করেন, তখন, প্রধানত, 'কাব্যতত্ত্ব'-এর কথাই তিনি ভাবছিলেন।

করব।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কবিতাকে প্লেটো যেক্ষেত্রে দর্শনের বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন (অন্তত দেখেছিলেন বলেই আমরা অনুমান করে থাকি), 'অ্যাপোলজি' অথবা 'ডিফেন্স'—কোনওটিরই লেখক সেক্ষেত্রে দর্শন ও কবিতার এই পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারটাকে মানতে চান না। 'অ্যাপোলজি'র লেখক, তাঁর নিবন্ধের সূচনাতেই, প্রাচীনকালের এমন অনেক দার্শনিক ও চিন্তানায়কের কথা আমাদের জানিয়ে দেন, যাঁরা—অন্তত প্রথম দিকে—কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন তাঁদের চিন্তালব্ধ শস্যসম্ভারকে, এবং সেই কারণে, সমকালীন জনসাধারণ যাঁদের, মূলত, কবি বলেই জানত।[৯] অর্থাৎ, যেটা তাঁদের বলবার কথা, সেটাকে তাঁরা কবিতার পোশাক পরিয়ে বলতেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন ছদ্মবেশী দার্শনিক। 'অ্যাপোলজি'র লেখকের এই বক্তব্য যে কবিতা ও দর্শনের মধ্যবর্তী পাঁচিলটাকে বেশ জোরালো রকমের একটা ধাক্কা মারে, তাতে সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে, 'ডিফেন্স'-এর লেখক সেই পাঁচিলটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য বললেন যে, কবিতার প্রতি যাঁর 'ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা'র কথা আমরা শুনে আসছি, সেই প্লেটোও আসলে একজন ছদ্মবেশী কবিই। বলা বাহুল্য, কবিতা ও গদ্যের কোনও কৃত্রিম বিভাজনকে শেলি কখনও মেনে নেননি। কবিতাকে শনাক্ত করতে গিয়ে তার শারীরিক গঠনবিন্যাসের উপরে চোখ রাখতেন না তিনি, গুরুত্ব আরোপ করতেন আমাদের ভাবনার যেটা ব্যক্ত রূপ, তার অন্যবিধ লক্ষণের উপরে। প্লেটোর রচনায় সেই লক্ষণগুলিকে যখন তিনি দেখতে পেলেন, তখন প্লেটো যে বস্তুত কবি, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হল না।[১০]

দার্শনিকেরা কিংবা ঐতিহাসিকেরা যে কেন কবিতার মাধ্যমে তাঁদের

৯. "...the philosophers of Greece durst not a long time appear to the world but under the masks of poets. So Thales, Empedocles and Parmenides sang their natural philosophy in verses. So did Pythagoras and Phocydides their moral counsels. So did Tyrtaeus in war matters and Solon in matters of policy." 'An Apology for Poetry'.

১০. "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error. The distinction between philosophers and poets has been anticipated. Plato was essentially a poet—the truth and splendour of his imagery, and the melody of his language, are the most intense that it is possible to conceive." 'A Defence of Poetry'.

তত্ত্বকথা অথবা ইতিবৃত্ত প্রচার করতেন, 'অ্যাপোলজি'র লেখকের কাছে তাও আমরা শুনেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, অন্য মাধ্যমের প্রতি সাধারণ মানুষের ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা ছিল কবিতার প্রতি। ফলত, সাধারণ মানুষদের কাছে কোনও বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হলে কবিতার মাধ্যমেই সে-কাজ করতে হত, তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। (কবিতার মাধ্যমকে সার ফিলিপ সিডনি আসলে 'a great passport' বা 'মস্ত একটি ছাড়পত্র' আখ্যা দিয়েছেন, যা থাকলে তবেই জনচিত্তে প্রবেশ করা যায়।) অতঃপর তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যান, এবং বলেন যে, দার্শনিকের চেয়ে কবির ভূমিকা আরও বড়, এবং তাঁর ক্ষেত্রও আরও ব্যাপক। দার্শনিকের কথা তো শুধু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকে বোঝে, অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষক। আর কবির কথা সেই তুলনায় অনেক সহজপাচ্য (তাঁর গ্রাহ্যতার ভূমিও তাই অনেক বড়), এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, কবিই হচ্ছেন জনগণের প্রকৃত দার্শনিক।[১১]

আর অনৃতভাষিতা? ঠাট্টা করে সিডনি বলছেন, পৃথিবী থেকে নানা গ্রহতারার দূরত্ব যাঁরা মেপে দেখান, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মিথ্যের বহরটা কি আরও বড় নয়? কিংবা চিকিৎসকদের? কবিরা বরং সবচেয়ে কম মিথ্যাবাদী। মিথ্যুক কারা? না যেটা সত্য নয়, সেটাকে যারা সত্য বলে জোর গলায় জাহির করে, তারাই হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু কবিরা (দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, সন্দেহে, সংশয়ে সারাক্ষণ যাঁরা পীড়িত, এবং 'যেন' ও 'হয়তো'র রাজ্যে যাঁরা ঘুরে বেড়ান) তো তেমন জোর গলায় কিছুই জাহির করেন না। মিথ্যেটাকে সত্যি বলে 'অ্যাফার্ম' করবার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠতে পারে না, কেননা, সিডনি বলছেন, 'অ্যাফার্ম' করাটাই তাঁদের ধাতে নেই। ("...the poet never affirmeth.")

অনৃতভাষিতার যে অভিযোগ, তার উত্তর অবশ্য অন্যভাবেও দেওয়া যায়। বলা যায় যে, যাকে আমরা 'অসত্য' ভাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতিশয়োক্তি মাত্র। এই যে অতিশয়োক্তি বা বাড়িয়ে বলা, যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, এর প্ররোচনা কোত্থেকে আসে, তো উত্তরে আমরা শিল্পীর আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে

১১. "...the philosopher teacheth, but he teacheth obscurely, so as the learned only can understand him, that is to say, he teacheth them that are already taught ; but the poet is the food for the tenderest stomachs ; the poet is indeed the right popular philosopher," 'An Apology for Poetry'.

একে যুক্ত করে দেখাতে পারি। বিজ্ঞানে কি ন্যায়শাস্ত্রে অতিশয়োক্তির কোনও অবকাশ নেই। তার কারণ, আবেগোচ্ছ্বাসেরও কোনও ভূমিকা নেই সেখানে। সেখানে যা-কিছু দাঁড়ায়, তা শুধু তথ্যভিত্তিক নিপাট যুক্তির উপরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ইংরেজিতে যাকে 'ক্রিয়েটিভ আর্জ' বলা হয়, শিল্পসৃষ্টির সেই আন্তর তাগিদের সঙ্গে আবেগোচ্ছ্বাস একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর তাই, কিছু-না-কিছু অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন সেখানে ঘটেই। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি :

"আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেই কো পুষ্পে পাতায়
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে"[১২]

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, অতিরঞ্জনের এই ব্যাপারটাকে তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর মানুষের সৃষ্ট শিল্পমালা তো সে ক্ষেত্রে অসংখ্য অতিরঞ্জনে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি যে শিল্পেরই অঙ্গ, সে-কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। বায়রন যখন বলেন :

"Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me back my heart !
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest !"[১৩]

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন :

"একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী"[১৪]

কিংবা আমাদের তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন :

"অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের
মুখে-মুখে রটে যায় নীরার খবর
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি"[১৫]

১২. অতিবাদ। 'ক্ষণিকা'।

১৩. Maid of Athens, ere we part. 'Occasional Pieces'.

১৪. শাশ্বতী। 'অর্কেস্ট্রা'।

১৫. নীরার অসুখ। 'বন্দী, জেগে আছো'।

তখন যুক্তিবাদী তার্কিক হয়তো বলবেন যে, এসব একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, বায়রন মোটেই তাঁর বক্ষ থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে সেটি আথেন্সের কোনো ললনার হাতে সমর্পণ করেননি, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে (শুধু সুধীন্দ্রনাথ বলে কথা কী, কোনও মর্ত্যমানবের পক্ষেই) সম্ভব নয় ইন্দ্রপুরীর আনন্দ আন্দাজ করা, এবং, সুনীল যা-ই বলুন, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুখে নীরা-নাম্নী একটি বালিকার খবর রটে যাওয়াটা একেবারে আদ্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার ; কিন্তু আমরা যারা অতিবাদকে শিল্পের অঙ্গ বলে জেনেছি, তারা এইসব উক্তির মধ্যে কোনও দোষ দেখব না, বরং শিল্পের রসে রঞ্জিত এই অতিশয়োক্তিগুলিকে আমরা কবিতার এক-একটি মহার্ঘ অলংকার বলেই চিনে নেব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তো বটেই, গানেও এই ধরনের অলংকার আমরা প্রচুর দেখতে পাই। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ছে "একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে" গানটির কথা। ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কবির তরুমূলে যে মেয়েটি একদা উপবেশন করেছিল, তাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন যে, সেদিনকার কথা তার হয়তো মনে নেই, কিন্তু নদী তাকে ভোলেনি ; এমন-কী, নদী তার স্রোতের মধ্যে সেই মেয়েটির বেণীর ছবিটিকে আজও ধরে রেখেছে।[১৬] শুনে সত্যান্বেষী তার্কিক হয়তো এক্ষেত্রেও বলবেন যে, এটা একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, নদী কাউকে মনে রাখে কিংবা আপন স্রোতোধারার মধ্যে ধরে রাখে কারও বেণীর চিত্র, এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। কিন্তু আমরা সে-কথা বলব না। আমরা ঠিকই বুঝে নেব যে, কবিই সেই মেয়েটিকে আজও ভুলতে পারেননি, এবং, নদীর বাঁকা স্রোতের দিকে চোখ পড়বামাত্র, কবিরই আজও সেই মেয়েটির বঙ্কিম বেণীর কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই সত্য কথাটা সরাসরি না-বলে কবি যে তাঁর স্মৃতিকে এক্ষেত্রে নদীর উপরে আরোপ করেছেন, এতেই বরং আরও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর গানের বাণী। এটা অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়, ঘুরিয়ে কথা বলবার ব্যাপার, কিন্তু অলংকার হিসেবে এর মূল্যও অপরিসীম।

কিন্তু আর নয়। কবিতার বিরুদ্ধে হরেক অভিযোগের ফিরিস্তি আমরা শুনেছি, এবং জেনেছি যে, কেন সেগুলি ধোপে টেঁকে না। সওয়াল-জবাবের মধ্য দিয়ে এই কথাটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, কবিতার প্রতি বিরূপ হবার সত্যি কোনও

১৬. "সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী..."

কারণ নেই। কিন্তু এটা হল নঞর্থক কথা, উলটো-দিক থেকে বিচার করবার ব্যাপার। এবারে সোজাসুজি আমরা কবিতার দিকে তাকিয়ে জেনে নিতে চাই যে, কোন্ সদর্থক (পজিটিভ) গুণ রয়েছে তার। বুঝতে চাই, তাকে আমরা সময় দেব কেন। অর্থাৎ, কেন আমরা কবিতা পড়ব।

কিন্তু তার আগে একটা সহজ কথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভাল। সেটা এই যে, কবিতা না-পড়লেই যে মানবজীবন একেবারে অচল হয়ে পড়বার আশঙ্কা, তা কিন্তু নয়। এমন একটা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা অনেকেই কল্পনা করেছেন, যেখানে কোনও মানুষেরই খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া, কাউকে সেখানে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাতে হবে না, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না, এবং প্রত্যেকেই সেখানে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু, অন্তত এখনও পর্যন্ত, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা কেউ কল্পনা করেননি, যেখানে সবাই দিনের মধ্যে অন্তত কিছুটা সময় গান শুনতে কিংবা ছবি দেখতে চাইবে। ঠিক তেমন, সর্বজনে যেখানে কবিতা পড়তে চাইবে, এবং পড়বার সুযোগ না-পেলে ভাববে যে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথাও কেউ কল্পনা করেননি।

কেন করেননি, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। কবিতাপাঠ আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয় না। হবার কোনও কারণও নেই। অন্ন বস্ত্র আশ্রয় কর্মসংস্থান চিকিৎসা সাক্ষরতা ইত্যাদি যে আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয়, তার কারণ, এগুলি ছাড়া কারও চলে না। কিন্তু যেমন গান কিংবা ছবি, তেমনি কবিতা ব্যতিরেকেও অসংখ্য মানুষের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সত্যি বলতে কী, তেমন মানুষ আমাদের চারপাশেই আমরা অহরহ দেখতে পাই। কবিতার প্রসঙ্গে বলি, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন বিস্তর প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, যাঁরা প্রতিবেশী আত্মীয় কিংবা বন্ধু হিসেবে হয়তো খুবই ভাল ও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কবিতা নামক ব্যাপারটার ছায়াও পারতপক্ষে মাড়ান না। কখনও যে তাঁরা কবিতা পড়েননি, তা হয়তো নয়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, কিন্তু সে তো নেহাতই পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে নোট্ মিলিয়ে পড়া, পরীক্ষার পাট চুকে যাবার পরে কবিতার সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছেন, এবং তার জন্যে যে তাঁদের জীবন কোথাও ঠেকে থাকছে, তাও নিশ্চয় নয়। একদা তাঁরা দায়ে ঠেকে, বাধ্য হয়ে গুটিকয় কবিতা পড়েছিলেন, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতার পর্ব শেষ হয়ে গেছে,

সুতরাং আর-কখনও তাঁরা কবিতা পড়বেন না।

অনেকেই পড়েন না। এবং তা সত্ত্বেও তাঁদের দিন দিব্যি কেটে যায়। যেমন গান না-শুনে এবং ছবি না-দেখেও অনেক মানুষেরই দিন দিব্যি কাটতে থাকে, এও তেমনই ব্যাপার, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং ধরে নেওয়াই ভাল যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা সকলের জন্য নয়।

কারও-কারও জন্য। জীবনানন্দ বলেছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সকলেই পাঠক নয়, কেউ-কেউ পাঠক।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পাঠক? কবিতা কি সত্যিই তাঁদের কিছু দেয়? যদি দেয়, তো সেটা কোন্ বস্তু? কী সেই প্রাপ্তি, যার প্রত্যাশায় তাঁরা কবিতার দিকে, আবহমান কাল ধরে, হাত বাড়িয়ে আছেন?

একটা প্রাপ্তির কথা আমরা 'ডিফেন্স'-এর লেখকের কাছেই শুনি। তিনি বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়। পৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে সে অনবগুণ্ঠিত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যে-বস্তুজগৎকে আমরা চিনি, তাকেও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।[১৭]

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"[১৮] সেদিক থেকে যদি দেখি, তা হলে বুঝতে হবে যে, কবির অনুভূতি এই যে ভাষার মধ্যে, অর্থাৎ রূপের মধ্যে, নিজের নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করছে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই পাঠকের পক্ষে একটা মস্ত প্রাপ্তি।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের আরও অনেক-অনেক উত্তর নিশ্চয় খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই, অন্য-কোনও উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত হবার আগে বরং এই দুটি উক্তিকেই আর-একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেলি বলছেন বস্তু-জগতের কথা (কবিতা যার গোপন সৌন্দর্যের নির্মোকটাকে খসিয়ে দেয়) আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আন্তর অনুভূতির কথা (রূপের মধ্যে যে-অনুভূতির নিত্যতা নিজেকে 'প্রতিষ্ঠিত করতে' চাইছে)। হঠাৎ শুনলে এই উক্তি দুটিকে—যার একটিতে দৃশ্য জগতের উপরে জোর পড়েছে ও অন্যটিতে আন্তর অনুভূতির উপরে—পরস্পরের বিরোধী বলে মনে

১৭. "It [poetry] awakens and enlarges the mind itself. ...Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were unfamiliar." 'A Defence of Poetry'.

১৮. আধুনিক কাব্য। 'সাহিত্যের পথে'।

হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তা যে নয়, বরং এই উক্তি দুটি যে পরস্পরের পরিপূরক, একটু বাদেই তা আমরা ধরতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা দিয়ে কবিতা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই অপরিহার্য দুটি অংশের কথাই দুই কবি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। একজন বলছেন বিষয়বস্তু বা উপকরণের কথা। অন্যজন উপলব্ধির।

বলা বাহুল্য, কবিতার যেটা বিষয়বস্তুর দিক—কোনও কাহিনী কিংবা কোনও ঘটনা কিংবা কোনও দৃশ্য—সরাসরি তার কাছ থেকেও আমরা অনেকেই অনেক-কিছু পেয়ে যাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ আমরা করতে পারি। রাত্রি যখন আসন্ন, গর্জিত মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে সঙ্গিহীন একটি পাখি তখন উড়ে চলেছে, তাঁর "দুঃসময়" কবিতার এই যে বিষয়বস্তু, শুধু এরই গুণে এই কবিতা যে কারও-কারও চিত্তে সাহসের সঞ্চার করে, আবার কারও-কারও চিত্তে প্রেরণা জোগায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও পরিণামের কথা চিন্তা না করে আপন ভূমিকায় সুস্থিত থাকতে, সে-কথা স্বীকার্য। ঠিক তেমনি "বর্ষশেষ" কবিতার বিষয়বস্তু আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে, হয়ে থাকে, নবীনতার অভ্যুদয়। আবার, একইভাবে, "মৃত্যুর পরে" কবিতাটি থেকে আমরা আমাদের শোকার্ত সময়ে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারি, এবং "দুই পাখি" কবিতাটির বিষয়বস্তু থেকে বুঝে নিতে পারি যে, সুখ ও স্বাধীনতা কেন, আত্যন্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এই যে সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষা এই কবিতাগুলির ভিতর থেকে অনেকে পেয়ে আসছেন, এবং আরও অনেককাল ধরে আরও অনেকে পাবেন, এসব প্রাপ্তির কোনওটিরই মূল্য কিছু কম নয়। কবিতা পাঠের খুবই মূল্যবান কয়েকটি পুরস্কার বলে এদের আমরা গণ্য করতে পারি। কিন্তু, বিষয়বস্তুর সঙ্গে এদের সরাসরি যোগ-সম্পর্ক সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে। সেটা এই যে, কবিতার নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যদি না পাঠকের কাছে এসে পৌঁছত, তা হলে এই সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার ব্যাপারটা ঠিক এতটাই জোর পেত কি না। তা যে কিছুতেই পেত না, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা বলতে পারি। আমরা জানি যে, এই ধরনের সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার কথা নানা নীতিগল্পের মধ্য দিয়েও আমাদের শোনানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই কথাগুলি সেখানে এর সিকির সিকি জোরও পায় না।

কেন পায় না, সেটা বুঝবার জন্যে শেলির কাছেই আবার আমাদের ফিরতে

হবে, এবং আর-একটু নজর করে দেখতে হবে তাঁর উক্তিটিকে। শেলি বলেছেন, কবিতা এই বস্তুপৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যার সৌন্দর্যকে গোপন বলা হচ্ছে, সেই বস্তুপৃথিবী নিজে কিন্তু গোপন নয়, আমাদের চোখের সম্মুখেই সে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এমন-কী, কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে যে তার সৌন্দর্যসম্ভার কারও চোখে পড়ে না, তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত, যাঁরা কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, তাঁরাও তার অরণ্যের শ্যামশোভা, পর্বতের ধূমল বিস্তার, নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ ও সমুদ্রের সফেন উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, তা-ই যদি হয়, তবে আর এই বস্তুপৃথিবীর সৌন্দর্যকে 'গোপন' বলবার অর্থ কী, এবং এমন কথাই বা আমরা কী করে মানব যে, কবিতা সেই সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়?

শেলির উক্তির দ্বিতীয়াংশে এসে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা। সেখানে তিনি বলছেন, সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন করে কবিতা তাকে "এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।" এই যে উক্তি, বস্তুত এটি একটি ধ্রুব ইঙ্গিত, এবং এরই সূত্র ধরে আমরা বুঝতে পারি যে, শেলি যাকে সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলছেন, আসলে তা বিভিন্ন বস্তুরই এমন এক ধরনের উপস্থাপনা, আমাদের প্রাত্যহিক পরিচিতির স্পর্শে মলিন নানা বস্তু যার ফলে কিছুটা রহস্যময়তা পেয়ে যায়। পুরনো, পরিচিত বস্তুসম্ভারকে সেই রহস্যময়তাই আবার নবীন করে তোলে।

তবে কি এসব বস্তুকে আমরা যেখান থেকে যেমনভাবে দেখি, কবিরা ঠিক সেখান থেকে দেখেন না বলেই তেমনভাবে দেখেন না? ঠিক তা-ই। তাঁদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন বলেই আলো-ছায়ার বদল ঘটে ও বস্তুগুলির তাৎপর্য অনেকটা পালটে যায়, এবং, কবিতা পড়বার সময়ে তাঁদের চোখ দিয়ে দেখি বলেই, আমাদের কাছেও সেই বস্তুগুলি কিছুটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, নির্দিষ্ট যে রূপের সীমার মধ্যে যাকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, শুধু তারই মধ্যে তার রূপগত সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, অন্যতর রূপও তার মধ্যে নিহিত হয়ে ছিল, এবং কবি আমাদের দেখিয়ে না-দিলে সেই অন্যতর রূপ আমাদের চোখে কখনও ধরাই পড়ত না।

বলা বাহুল্য, যেমন বস্তু সম্পর্কে, তেমনি বিষয় সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। কবি তাঁর আপন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর আপন অনুভূতি অথবা উপলব্ধির

আলোয় যখন দেখেন, তখন তাঁর সেই দেখার গুণে আমাদের পরিচিত নানা বিষয়ের তাৎপর্যও অনেকখানি পালটে যায়, এবং তারই ফলে আমাদের চিত্তে সেইসব বিষয়ের অভিঘাত আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, সেই অভিঘাত যদি সাহস, প্রেরণা, শিক্ষা কিংবা সান্ত্বনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে না উঠত, তাতেও কোনও ক্ষতি ছিল না।কেননা, কবিতার কাছে আমাদের প্রাপ্তি শুধু এইটুকুই নয়, আরও বেশি। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন। যার অভিঘাত আরও ব্যাপ্ত হয়ে, বস্তুত আমাদের সমগ্র চিত্ত জুড়ে কাজ করতে থাকে। শেলি যে বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়, এই হচ্ছে তার তাৎপর্য। তিনি যে আসলে বস্তুজগতের উপরে জোর দেননি, জোর দিয়েছেন কবির চোখে চোখ মিলিয়ে তাকে দেখবার উপরে, তা আমরা জেনেছি। জেনেছি যে, যাকে তিনি সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলেছিলেন, আসলে সেটা আমাদের প্রতিদিনের দেখা সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কারের ব্যাপার। কবি তাঁর আপন উপলব্ধির আলোয় তাকে খুঁজে নেন, এবং আমাদের চোখের সামনে তাকে তুলে ধরেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে এই যে পরিচয়, প্রাপ্তি হিসেবে এরই মূল্য হয়তো সর্বাধিক। কবিতা এই পরিচয়ের ক্ষেত্র রচনা করে দিচ্ছে ; একের উপলব্ধিকে সে সর্বজনের করে তুলছে। শুধু তা-ই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল একটি বিশেষ মানুষের একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি, তাকে সে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে নিত্যকালের দুয়ারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়", তখন কবিতার এই নিত্যকালীন আবেদনের কথাটাই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন।

কবিতা কোথায়

কবিতাকে সাধারণত দুটি দিক থেকে দেখা হয়ে থাকে। তার ভাষা ও তার ভাবনা। কিন্তু ভাষা যেমন ভাবনাকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে, তেমনি ভাবনারও একটা অবলম্বন চাই। বিষয়বস্তু সেই অবলম্বন। ফলত, আমরা যখন কাব্যবিচার করতে বসি, তখন, ভাষা ও ভাবনার মতো, বিষয়বস্তুও আমাদের বিচার্য বৃত্তের মধ্যে এসে যায়। বাংলা কবিতায়, এই তিন দিক থেকেই, রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।

শুধু সূচনা করেছিলেন বললে অবশ্য খুবই কম বলা হয়। কেননা, এ-ব্যাপারে তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ও তাৎপর্যময় একটি পরিণতির ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার দায়িত্বভারও, অনেক পরিমাণে, তিনি নিজেই বহন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা যে তাঁর সমকালীন সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে অনেকেরই প্রশংসা পায়নি, বরং ধোঁয়াটে, কষ্টকল্পিত কিংবা অর্থহীন বলে নিন্দিত হয়েছিল, তার অন্তত একটা কারণ এই যে, এইসব কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই কোনও পূর্ব-পরিচয় ছিল না। "রবি অস্ত যায়। / অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।"[১]—ভাষার এই যে বিন্যাস, রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাষার বিন্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্য নেহাত অল্প নয়। আবার "অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দুর",[২]—এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাবনার কোনও মিল আমাদের চোখে পড়ে না। ঠিক তেমনি, সুখ ও স্বাধীনতার চিরন্তন বিচ্ছেদকে বিষয়বস্তু করে তিনি যখন "দুই পাখি" কবিতাটি লেখেন, তখন যেমন ভাষা ও ভাবনা, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও রবীন্দ্রপূর্ব যুগের কবিতার সঙ্গে তাঁর এই কবিতার কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বিচার করতে বসে তাঁর সমকালীন সমালোচকদের অনেকেই যে পদে-পদে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাতে অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই।

১. নিষ্ফল কামনা। 'মানসী'। ২. অপেক্ষা। ঐ।

রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন আদ্যন্ত একটি নবীনতা ছিল, রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাষা, কাব্যভাবনা ও কাব্যবিষয়ের মধ্যে যার জন্মসূত্রটিকে খুঁজে পেলে তাঁর সমালোচকরা অবশ্যই স্বস্তিবোধ করতেন। কিন্তু তা তাঁরা খুঁজে পাননি। যাতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না ও যার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, তার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা ধাঁধায় পড়ে যান। প্রসঙ্গত আমরা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উল্লেখ করতে পারি। "পসারিনী" কবিতা সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, "সমগ্র কবিতাটির উদ্দেশ্য বা অভিধেয় কী, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"[৩] "শেষ খেয়া" কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিও তাঁর কাছে "হেঁয়ালির মত"[৪] ঠেকেছিল। বিভ্রান্তির ধরনটা যে কী, এর থেকেই তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

একা সুরেশচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এবং এমন কথাও ভাববার কোনও হেতু নেই যে, রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার প্রথম পর্যায়ে যে বিচার-বিভ্রাট আমরা দেখতে পাই, তা একেবারেই নজিরবিহীন একটা ব্যাপার। আসলে সাহিত্যে যখনই কোনও সর্বাঙ্গীণ নবীনতার অভ্যুদয় ঘটে, তখনও তার বিচারে এই ধরনের বিভ্রম ও বিভ্রাট দেখা দেয়। যেমন বঙ্গসাহিত্যে, তেমনি অন্যত্রও সেটা লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি যে, মার্কিন দেশের সমালোচনা-সাহিত্যেও ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতাকে কেন্দ্র করে, এই বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হুইটম্যানের কাব্যসংকলন 'লিভ্‌স অব গ্রাস্'। মার্কিন সাহিত্যের প্রধান পুরুষ ইমার্সন তখন এই যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রণেতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন[৫] ঠিকই, কিন্তু, অন্যদিকে, আকাশ কালো করে দেখা দিয়েছিল আক্রোশের ঝড়। সাহিত্যের আঙিনায় ধিক্কারের ধুলো সেদিন কম ওড়েনি। 'বস্‌টন ইন্‌টেলিজেন্‌সার' পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন, "মনুষ্যত্ব যেখানে সম্মান দাবি করে, সেখানে এই গ্রন্থের স্থান হওয়া উচিত নয়। এর লেখক বস্তুত পশুরও অধম একটি জীব ; সুতরাং সভ্যসমাজ থেকে একে লাথি মেরে বার করে দেওয়া উচিত। খাপছাড়াভাবে বিস্তর বক্‌বক্ করেছে লোকটা। সেই বক্‌বকানির মধ্যে না আছে কোনও বুদ্ধিমত্তার ছাপ, না কোনও শৃঙ্খলা। আমাদের ধারণা, লোকটা একেবারেই গারদ-থেকে-পালানো একটি উন্মাদ, তারস্বরে

৩. সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ৪. ঐ, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৫. ইমার্সন বলেছিলেন, "I greet you at the beginning of a great carrer."

প্রলাপ বকে যাচ্ছে।"[৬]

হুইটম্যানের কবিতার ভাষা সম্পর্কে এক মার্কিন সমালোচক এই যে 'বকবকানি' (ব্যাবলিং) কথাটা ব্যবহার করেছেন, এইটে শুনে একেবারে অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মন্তব্য :

"উড়িসনে রে পায়রা-কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা,
বক্‌বকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব-মাখা,
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল
নগদ মূল্য একটাকা।"[৭]

কালীপ্রসন্নের এই ছত্র ক'টি রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতার কয়েকটি ছত্রের বিদ্রূপাত্মক অনুকৃতি হিসেবে রচিত হয়েছিল। উপরন্তু 'বক্‌বকম্' আর 'ফোঁসফোঁসানি' শব্দ দুটিও এসেছিল রবীন্দ্রনাথেরই ব্যবহৃত ওই শব্দযুগলের সূত্র ধ'রে। তবু এই প্যারডি থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষাকে কাব্যবিশারদ বস্তুত অর্থহীন হট্টগোল বলেই মনে করতেন। কেন মনে করতেন, তাও আমরা অনুমান করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, কাব্যবিশারদের অন্য যত গুণই থাক, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আদ্যন্ত নবীন যে ভাষারুচির সূচনা সেদিন দেখা গিয়েছিল, অন্তত সে সম্পর্কে তিনি বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন না। তার তাৎপর্য তিনি আদৌ ধরতে পারেননি।

'চণ্ডালিকা'র কথা মনে পড়ে। মা সেখানে মেয়ের কথা শুনে বলেছিলেন, "আমি যে তোর ভাষা বুঝিনে।" সমালোচকদের অবস্থাও অনেক সময় প্রকৃতির মায়ের মতোই করুণ হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা, ভাবনা কিংবা

৬. "This book should find no place where humanity urges any claim to respect, and the author should be kicked from all decent society as below the level of the brute. There is neither wit nor method in his disjointed babbling, and it seems to us he must be some escaped lunatic, raving in pitiable delirium." *Boston Intelligencer*. May 3, 1856.
('লিভ্‌স অব গ্রাস্'-এর মর্ডান লাইব্রেরী-সংস্করণে কার্ল স্যান্ডবার্গ-লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

৭. 'মিঠে-কড়া'। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

বিষয়ের তাৎপর্য তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। তখন তাঁদের অনেকে যেমন অস্বস্তি বোধ করেন, তেমনি অনেকে আবার রেগেও যান। মার্কিন সমালোচনাসাহিত্যে, হুইটম্যানের কবিতাকে কেন্দ্র করে, সেই রাগের আগুন কীভাবে জ্বলেছিল, আমরা দেখেছি। এবারে ফরাসি সমালোচনাসাহিত্যের দিকে চোখ ফেরালেও সেই একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাব। দেখব যে, বদলেয়ারের কবিতার ভিতর দিয়ে যখন এক সর্বাঙ্গীণ নবীনতার সূচনা হচ্ছিল, এবং প্রবর্তনা ঘটছিল নূতন ভাবনা ও নূতন বিষয়বস্তুর, সমকালীন সমালোচকদের ক্রোধের আগুন তখনও কিছু কম জ্বলেনি। শিরার্ তখন মন্তব্য করেছিলেন, "ভয়ংকরের সীমানা যখন শেষ হয়ে যায়, মানুষ তখন ন্যক্কারজনকতার তল্লাটে গিয়ে ঢোকে। আঁকতে থাকে নোংরা বিষয়ের ছবি। নোংরামিই তখন তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় ; তারই মধ্যে সে গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু সেই নোংরামির নূতনত্বও ফুরিয়ে যায় এক সময়ে ; শবদেহ পচে-গলে গিয়ে ছড়াতে থাকে দুর্গন্ধ, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা অকথ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, কোনও ভাষাতেই যার কোনও নাম নেই। বাস্, এই যে অকথ্য অবস্থা, এই হচ্ছে বদলেয়ারের কাব্য। Voilá Baudelaire."[৮]

শিরার্ যে নেহাত ঝোঁকের মাথায় এই মন্তব্য করেছিলেন, তাও নয়। বস্তুত, এই সমালোচনা লিখবার বেশ কয়েক বছর পরেও তাঁকে আমরা একই কথা বলতে শুনি। একই রকমের ঝাঁঝালো ভাষায় তখনও তিনি রায় দেন যে, বদলেয়ার ভাল কবি কি মন্দ কবি, এই প্রশ্নটাই একেবারে অর্থহীন, কেননা বদলেয়ার আদৌ একজন শিল্পী কিংবা কবি নন। তাঁর মন নেই, আত্মা নেই, রুচি নেই, প্রতিভা নেই। তাঁর মধ্যে এমন প্রবণতা একটিও নেই, যাকে আন্তরিক, সরল কিংবা মানবিক বলা যেতে পারে। আসলে তিনি একটি বর্বর।[৯] শুনে 'বস্টন ইনটেলিজেন্সার'-এর সেই অসহিষ্ণু সমালোচকের কথাই আবার মনে পড়ে যায় আমাদের, 'লিভ্স অব গ্রাস'-এর লেখক সম্পর্কে যিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটা আসলে "পশুরও অধম একটি জীব"।

এই যে অসহিষ্ণুতা আর ক্রোধ, আমরা জানি যে, ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যেও বারে-বারে এর সম্মুখীন হব আমরা। দেখতে পাব, সাহিত্যে যাঁরা নূতন ভাবনা কিংবা নূতন বিষয়বস্তুর দিশারি, সেখানেও তাঁরা ক্ষমাহীন

৮. ৯. 'A History of Modern Criticism : 1750-1950'. Rene Wellek. (পৃ ৮২-৮৩)

আক্রোশের লক্ষ্য হচ্ছেন। শেলি যার উত্তরে তাঁর 'ডিফেনস' লিখেছিলেন, টমাস লভ পিককের সেই চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধটির[১০] কথাই ধরা যাক। পিকক সেখানে অবশ্য একেবারে উলটো দিক থেকে চালিয়েছিলেন তাঁর আক্রমণ। ওয়র্ডসওয়র্থ, কোলরিজ, বায়রন এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ্য অভিযোগটা এই ছিল যে, 'এঁদের কবিতার বিষয়বস্তু বড্ডই সেকেলে, ফলত পাঠকদের এঁরা অতীতের অন্ধকারেই বন্দী করে রাখছেন, তার থেকে আর আধুনিক ও সুসভ্য পৃথিবীর আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না। সমকালীন ও সদ্য-বিগত যুগের কবিদের সম্পর্কে, সাধারণভাবে, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ফ্রান্সে, উনিশ শতকের শেষার্ধে, বদলেয়ারকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়েছিলেন সমালোচক শিরার্। কিন্তু তিনি যে নতুন কিছু করেননি, সেটা আমরা তখনই বুঝতে পারি, এই প্রবন্ধ পড়তে-পড়তে যখন আমরা দেখি যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সময়কার ইংরেজ কবিদের গায়ে পিককও মোটামুটি এই একই লেবেল সেঁটে দিয়েছিলেন। পার্থক্যটা শুধু এই যে, পিকক তাঁদের পুরো-বর্বর বলেননি, বলেছিলেন, 'আধা-বর্বর'।[১১]

শুনে আমরা বিস্মিত হই যে, টমাস লভ পিকক নিজেও ছিলেন একজন কবিই। একজন কবি আর-একজন কবির মানস প্রক্রিয়াকে, অন্য অনেকের তুলনায়, সহজে চিনে নিতে পারবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত। পিকক তা হলে, নিজে কবি হয়েও, তাঁর সময়ের বিশিষ্ট কয়েকজন কবির মানস প্রক্রিয়াকে চিনতে পারলেন না কেন? ওয়র্ডসওয়র্থ, কোলরিজ আর বায়রনের কবিতার বিষয়বস্তুকে কেন নেহাতই অতীতাশ্রয়ী বলে মনে হল তাঁর? যাকে তিনি অতীতাশ্রয়ী ভেবেছিলেন, আধুনিক চিত্তের কাছেও যে তার রেলিভ্যানস্ বা প্রাসঙ্গিকতা কিছুমাত্র নষ্ট হয়ে যায়নি, তা তিনি কেন বুঝে উঠতে পারলেন না? তবে কি আমরা এই সিদ্ধান্ত করব যে, কাব্যবিচারে কবির কথাও সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়? ঘুলিয়ে যায় তাঁরও বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতা?

পরবর্তী কালের একজন সমালোচক—এইচ এ. নিডহ্যাম—ঠিক এই ইঙ্গিতই করেছেন। শেলির 'ডিফেন্‌স্'-এর পশ্চাৎপটের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে, পিককের এই প্রবন্ধ—অন্তত অংশত—উৎপন্ন হয়েছিল অসূয়া

১০. The Four Ages of Poetry.

১১. "A poet in our times is a semi-barbarian in a civilized society."

থেকে। যাঁদের তিনি (পিকক) তাঁর চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন কবি বলে জ্ঞান করতেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর তুলনায় অনেক বেশি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। পিকক সেটা সহ্য করতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল এমন কয়েকজন কবির দিকে, যাঁদের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি তাঁর গাত্রদাহের কারণ ঘটিয়েছিল, এবং যাঁদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠাকে তিনি সহজ চিত্তে মেনে নিতে পারছিলেন না।

হয়তো তা-ই। অনেক ক্ষেত্রেই ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষ যেমন অকারণ নিন্দাবাদে অনেককে উৎসাহিত করে, তেমনি এক্ষেত্রেও হয়তো করেছিল। কিন্তু, একটা প্রশ্ন তবু থেকে যায়। সেটা এই যে, ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষের স্পষ্ট কোনও কারণ যেক্ষেত্রে অনুপস্থিত, সেক্ষেত্রেই কি একজন কবি অন্য-কবির রচনায় উৎকীর্ণ নবীনতার লক্ষণগুলিকে সর্বদা চিনে নিতে পারেন? তাও যে পারেন না, সর্বদা পারেন না, হুইটম্যান সম্পর্কে সুইনবার্নের বিমুখতাই তার প্রমাণ। হুইটম্যানের কবিতায় যে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, এবং প্রচলিত নানা প্রথা, ব্যবস্থা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্ত হয়েছিল যে অনাস্থা, প্রথম দিকে তা খুব ভালই লেগেছিল সুইনবার্নের ; এমন-কী ১৮৭২ সনের একটি রচনায়[১২] তিনি হুইটম্যানের দুটি দীর্ঘ কবিতার[১৩] অনর্গল প্রশংসাও করেছিলেন, কিন্তু, অন্যদিকে, হুইটম্যানের কবিতার বহিরঙ্গ-বিন্যাস তিনি মেনে নিতে পারেননি। আমরা জানি যে, এ-ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ক্রমে আরও প্রবল হবে। জানি যে, প্রথম দিকে যিনি হুইটম্যানের অনুরাগী ছিলেন, শেষের দিকে তিনি বিপুল বিতৃষ্ণায় ফিরিয়ে নেবেন তাঁর মুখ। অমসৃণ আঙ্গিক এবং ছন্দের বিশৃঙ্খল বিন্যাসের দরুন হুইটম্যানের কবিতাকে তখন আর সহ্যই করতে পারবেন না তিনি। নিজে একজন খাঁটি কবি হয়েও তিনি ধরতে পারবেন না যে, আর-একজন খাঁটি কবি তাঁর কবিতাকে ঠিক কোন্‌খানে নিয়ে পৌঁছে দিতে চাইছেন, কিংবা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছেন কোন্ কাজ। বুঝতে পারবেন না যে, এই অমসৃণতা আর এই বিশৃঙ্খলা অদক্ষতার ফসল নয়। কবিতার কাঠামো আর ছন্দ সম্পর্কে তখনকার যেটা স্বীকৃত, প্রচলিত অভ্যাস, সেই অভ্যাসকে যে হুইটম্যান আসলে ভাঙতেই চান, প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান কবিতাকে, এই সহজ সত্যটাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবে। ফলে, সুইনবার্নও তখন বিদ্রূপ করবেন হুইটম্যানকে, এবং তাঁর প্রবর্তিত কাব্যরীতি যে কারও আগ্রহ আকর্ষণের যোগ্য

১২. 'Under the Microscope.'

১৩. "Out of the Cradle Endlessly Rocking" ও "When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed".

নয়, নিতান্তই একটা বাতিকের ব্যাপার মাত্র, এইটে ধরে নিয়ে, ১৮৭৭ সালে লিখবেন তাঁর 'হুইটম্যানিয়া'।

কবিতার সমালোচনায় কেন যে এই ধরনের বিভ্রাট ঘটে, পরবর্তী কালে যা অসংখ্যজনের আনন্দে সমর্থন, শোকে সান্ত্বনা ও বিপর্যয়ে সাহস জোগাবে, কিংবা—তা যদি না-ও জোগায়—অনাবিষ্কৃত নানা সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে অসংখ্যজনের, আপনকালের সমালোচকদের অনেকের কাছ থেকেই যে অনেকক্ষেত্রে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিংবা তিরস্কার কুড়োতে হয় কেন, এবং—এমন-কী—আপন কালের কবিরাও যে কেন অনেকক্ষেত্রে তাকে তার সত্য-পরিচয়ে চিনে উঠতে পারেন না, এই নিবন্ধের সূচনাতেই তার আভাস আমরা দিয়েছি। বিভ্রাট ঘটে, কেননা আমরা অধিকাংশ মানুষই অভ্যাসের দাস, এবং যা একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে নূতন, তাতে আমরা অভ্যস্ত নই বলেই আমাদের চিত্তে তা একটা ভয়ঙ্কর রকমের অস্বস্তি জাগিয়ে দেয়। ভাল করে তাকে বিচার করি না আমরা। তার আগেই তাকে আমরা বর্জন করে বসি।

নূতন সম্পর্কে এই যে অস্বস্তি ও আতঙ্ক, শুধু সাহিত্য বলে কথা নেই, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর একটা মস্ত ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে, মনুষ্যেতর প্রাণী-সমাজও এই অস্বস্তি ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত নয় ; বরং, হরেক ব্যাপারে, নানা প্রাণীর জীবনে এর প্রভাব আরও বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, মানুষ যত সহজে তার নব-নব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অন্যান্য অনেক প্রাণীই তত সহজে সেটা পারে না। না-পারবার কারণ আর কিছুই নয়, নূতন পরিবেশ সম্পর্কে তাদের অস্বস্তি ও আতঙ্ক, মানুষের তুলনায়, অনেক বেশি প্রবল। কিন্তু এই অস্বস্তি যে তাদের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয় না, বরং তাদের অস্তিত্বকেই ক্রমে বিপন্ন করে তোলে, জীব-বিজ্ঞানীরাই সে-কথা আমাদের জানিয়ে দেবেন। উদ্বর্তন-প্রক্রিয়ায় যারা টিকে থাকতে পারেনি, সেইসব প্রাণীর অপারগতার সঙ্গে এই অস্বস্তিকে তাঁরা কার্যকারণের সূত্রে যুক্ত করে দেখাবেন। তাঁরা বলবেন যে, যে-সমস্ত কারণে বিস্তর প্রাণী এই ধরাধাম থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে একটা মস্ত কারণ হচ্ছে 'নিওফোবিয়া'।

কিন্তু আমরা যখন 'নিওফোবিয়া'র কথা বলি, তখন মানস প্রক্রিয়ার মাত্র একটা দিকের কথাই আমরা বলি। অন্যদিকে রয়েছে 'নিওফিলিয়া', অর্থাৎ নূতন সম্পর্কে একটা আগ্রহ, আকর্ষণ বা প্রীতির ভাব। মানবজীবনে এই আগ্রহ যে তার অস্বস্তিকে প্রায়শ ছাপিয়ে যায়, তা আমরা জানি। আমরা জানি যে, তা যদি না যেত, নব-নব পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষ তা হলে এত অনায়াসে সংগতি রক্ষা

করতে পারত না।

সত্যি বলতে কী, মানুষের জীবনে পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তন যত দ্রুত ঘটেছে, এমন আর অন্য কোনও প্রাণীর জীবনে নয়। মানুষের বয়স মোটামুটি দশ লক্ষ বছর হল। অন্যদিকে, কৃষি-কর্মের ভিতর দিয়ে যদি তার সভ্য-জীবনের সূচনা হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে যে, সেই সভ্যতার বয়স মোটামুটি দশ হাজার বছর। অর্থাৎ তার সভ্যতার বয়স তার মোট বয়সের একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মোট বয়সের এই যে অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ, মানুষের যা কিছু অগ্রগতি, সেটা এরই মধ্যে ঘটেছে। এরই মধ্যে সে সাদাসিধে কৃষিজীবন থেকে জটিল যন্ত্র-জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে, এরই মধ্যে সে গ্রাম থেকে নগরের পথে পা বাড়িয়েছে, এরই মধ্যে সে মস্ত-মস্ত মন্দির, হর্ম্য, সেতু, দুর্গ আর কলকারখানা বানিয়েছে, এরই মধ্যে সে তৈরি করেছে জাহাজ-রেলগাড়ি-মোটর-এরোপ্লেন, এবং এরই মধ্যে তার ক্রমাগ্রসরমান সভ্য-জীবনের আরও অসংখ্যবিধ অনুষঙ্গ সে সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ জটিল থেকে ক্রমে আরও জটিল হয়েছে তার জীবন-ব্যবস্থা। আমরা এখানে এক নিশ্বাসে এ-সব কথা বললুম বটে, কিন্তু আজকে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেইখানে এসে পৌঁছবার জন্য মানুষের সভ্যতাকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যে মস্ত-মস্ত বাঁক নিতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, যতবার তার সভ্যতা বাঁক নিয়েছে, একটি খাতকে পরিত্যাগ করে প্রবাহিত হয়েছে অন্য খাতে, ততবারই মানুষকে সম্মুখীন হতে হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ ও নূতন পরিস্থিতির। সেই নূতনতার সঙ্গে তার জীবনের সংগতি রক্ষা করে চলতে পেরেছে বলেই নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে তার অগ্রগতি ; নূতনকে বার-বার আবাহন ও আত্মস্থ করতে না পারলে সেটা সম্ভব হত না।

বলা বাহুল্য, সামগ্রিক মানসসভ্যতার গতিবিভঙ্গ এখানে আমাদের বিবেচ্য নয় ; এমন-কী, সামগ্রিকভাবে তার শিল্প-সংস্কৃতির দিকেও আমরা এখানে চোখ রাখিনি। কবিতা, শুধু কবিতাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কবিতার যে স্রোতোধারা, বাল্মীকি কিংবা হোমারের কাল থেকে তাকেও কি নিতান্ত কম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে? দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তাকেও বাঁক নিতে হয়েছে অসংখ্যবার, এবং—তার চেয়েও যেটা বড় কথা— যতবার সে আকস্মিকভাবে বাঁক নিয়েছে, ততবারই তার পাঠক আর সমালোচককে সম্মুখীন হতে হয়েছে অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত, এবং সেই কারণেই অস্বস্তিজনক, এক-একটি পরিস্থিতির।

অস্বস্তি ভাষা নিয়ে, অস্বস্তি ভাবনা নিয়ে, অস্বস্তি বিষয়বস্তু নিয়ে। এবং সেই অস্বস্তির সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যখন যুগান্তকারী এক-একটা পরিবর্তন ঘটে যায়, তখন তার গুরুত্ব পরিমাপের যোগ্য কোনও মানদণ্ড কিংবা মূল্য যাচাইয়ের যোগ্য কোনও নিকষ আমাদের হাতে থাকে না। নূতন কোনও মানদণ্ড কিংবা নিকষ যে খুঁজে নেওয়া দরকার, তাও আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না। যা আমাদের হাতে থাকে, সেই পুরনো মানদণ্ড আর পুরনো নিকষের সাহায্যেই আমরা কবিতার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভূত সেই নূতন পরিস্থিতির গুরুত্ব পরিমাপের ও মূল্য যাচাইয়ের চেষ্টা করি। তাতে আমাদের বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনা আরও বাড়ে মাত্র।

বিদেশি লেখক তাঁর লেখার মধ্যে অনেকটা এই রকমের বিড়ম্বনার একটি প্রতীক-চিত্র পেশ করেছেন। পথের এক ধারে একটি বাতিস্তম্ভ, সেই বাতিস্তম্ভ গোটা-পথের অন্ধকার দূর করতে পারেনি, শুধু অল্প একটুখানি জায়গা জুড়ে ছোট্ট একটি আলোর বৃত্ত রচনা করে রেখেছে, আর সেই বৃত্তের মধ্যে আতিপাতি করে কী যেন খুঁজছে একটি লোক। যে-বস্তু খুঁজছে, তা কিন্তু ওই বৃত্তের মধ্যে হারায়নি, হারিয়েছে বৃত্তের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে। তা হলে বৃত্তের বাইরে গিয়ে সে খুঁজছে না কেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে লোকটি বলেছিল, "কী করে খুঁজব, ওখানে যে আলো নেই!"

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা দেখা দেয়। সেখানে যখন সর্বাঙ্গীণভাবে নূতন কোনও সৃষ্টির সম্মুখীন হই আমরা, এবং নূতনত্বের জন্যই যখন তাকে বড় রহস্যময় ঠেকতে থাকে, তখন আমরাও এই একই কাজ করি, কাব্যের সঙ্গে আমাদের পূর্ব-পরিচয়ের যে একটি পুরনো বৃত্ত রয়েছে, তারই মধ্যে খুঁজতে থাকি এই সদ্যোজাত রহস্যের সমাধান। সমাধান, বলা বাহুল্য, মেলে না। আমরাও, বলা বাহুল্য, পারতপক্ষে সেই বৃত্তের বাইরের অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াতে চাই না। তার পরিবর্তে, আমাদেরই উদ্যমের অভাবে যা আমাদের উপলব্ধির অগম্য থেকে যাচ্ছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভিতর দিয়ে তাকে আমরা বর্জন করি। কোনও রচনার মধ্যে যখন আমাদের কবিতা-সংক্রান্ত পূর্ব-ধারণার সমর্থন মেলে না, তখন বলি যে, তার মধ্যে কবিতা নেই। যা বুঝি না, ধরেই নিই যে, তা বুঝবার যোগ্য নয়। এবং এইভাবেই এক-একটি নবজাত কাব্যরীতিকে অবহেলা অথবা বিদ্রূপের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবার প্রয়াস পাই আমরা।

কিট্সের হত্যাকারী কে? "হু কিলড্ জন কিট্স?" বায়রনের কবিতার প্রথম

পঙ্‌ক্তিতে উত্থাপিত এই যে প্রশ্ন, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেই এর উত্তর মিলে যায়। 'কোয়ার্টার্লি' পত্রিকাকে দিয়ে বায়রন সেখানে কবুল করিয়ে নেন যে, সে-ই কিট্‌সের হত্যাকারী। অর্থাৎ, আরও অনেকের মতো, বায়রনও বিশ্বাস করতেন যে, নিন্দামন্দে 'কোয়ার্টার্লি'র রসনা যদি না অত প্রখর হয়ে উঠত, তা হলে হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচতেন কিট্‌স, নিতান্ত ছাব্বিশে তাঁকে বিদায় নিতে হত না। কিন্তু শুধু 'কোয়ার্টার্লি' বলে কথা নেই, প্রতিষ্ঠিত একাধিক কবিও যে সেদিন কিট্‌সের কাব্যরীতিকে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছিলেন, তাও নিশ্চয় স্বীকার্য। যদি প্রশ্ন ওঠে, সেই কাব্যরীতির তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেননি কেন, তা হলে তার উত্তর নিশ্চয় এই হবে যে, আত্মতৃপ্ত তাঁরাও তাঁদের পুরনো বৃত্তের মধ্যেই বসে ছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল কাব্যবিচারের পুরনো মানদণ্ড, একটি নূতন কাব্যরীতির তাৎপর্য বিচারে যা কিনা কোনও কাজে লাগে না।

অনেককাল আগে শোনা দুটি পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ে :

> ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি,
> নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি মরি!

এ হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত রকমের বিড়ম্বনার একটি চিত্র। যা দিয়ে সে সোনার শুদ্ধতা যাচাই করে থাকে, তাই দিয়ে যে পদ্মফুলের শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব নয়, জহুরি সে-কথা জানে না।

কিন্তু এই জহুরিকে যে নির্বোধ বলব, এমন সাহস আমাদের কোথায়? বস্তুত, তাকে নিন্দা করলে সেটা আত্মনিন্দা হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, কষ্টিপাথর দিয়ে ফুলের শুদ্ধতা যাচাই করতে গিয়ে যে-ভুল সে করেছে, কবিতার শুদ্ধতা যাচাই করতে গিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সেই একই ভুল আমরা করে থাকি। আমরা পুরনো কষ্টিপাথর কিংবা পুরনো মানদণ্ড দিয়ে এমন কবিতাকে বিচার করতে যাই, ভাষায় ভাবনায় ও বিষয়বস্তুতে যা একেবারে আদ্যন্ত নবীন। ফলে, নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আমাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ভাষা, ভাবনা ও বিষয়, এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছই আমরা।[১৪] যে-ভাষা, যে-ভাবনা ও যে-বিষয়বস্তুকে কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, শুধু তারই মধ্যে আটকে থাকে আমাদের দৃষ্টি। তার বাইরে আমাদের

১৪. ম্যাথু আর্নল্ডের মতো ডাকসাইটে কবি-সমালোচকও যে অন্তত শেলির কাব্যবিচারে, সার্বিক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তাঁর একটি উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে। পলগ্রেভের 'গোলডেন ট্রেজারি'তে সন্নিবেশিত শেলির কবিতামালা সম্পর্কে আর্নল্ডের বক্তব্য : "...a gallery of his failures."

নজর চলে না। আমরা বুঝতে পারি না যে, কবিতা কোনও বিশেষ ভাষা, বিশেষ ভাবনা কিংবা বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে আটকে থাকবার ব্যাপার নয়। কবিতা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। যায়ও।

আংশিক ভ্রান্তির দৃষ্টান্তও নেহাত কম নয়। বরং প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, কোনও কবির রচনাকে বিচার করতে বসে এক ক্ষেত্রে যিনি পুরনো মানদণ্ড পরিত্যাগ করতে পারছেন, অন্য ক্ষেত্রে তিনি পুরনো অভ্যাস বা সংস্কারের মায়া কাটাতে পারছেন না। সুইনবার্নের কথা আগেই বলেছি। প্রচলিত নানা বিধান-ব্যবস্থা সম্পর্কে হুইটম্যানের কবিতায় যে 'হেরেসি' বা বিদ্রোহভাবের দেখা মেলে, সুইনবার্ন সেটা পছন্দই করছিলেন। এই বিদ্রোহ যে স্বাগত, এবং কবিতার স্বাস্থ্য যে এতে নষ্ট হবে না, বরং এরই ফলে যে তার রক্ত আরও শুদ্ধ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, সে-কথা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ভাবনাগত বিদ্রোহের সঙ্গে কবিতার ভাষা আর ছন্দেও হুইটম্যান যে-বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিলেন, সুইনবার্ন তার প্রয়োজনীয়তাকে মানতে পারলেন না। 'ফ্রি ভর্স' তার কানে বড়ই বেখাপ্পা ঠেকল। তিনি বুঝলেন না যে, বিদ্রোহটাকে শুধুই ভাবনা কিংবা বিষয়বস্তুর মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয়, এক ক্ষেত্রের বিদ্রোহ স্বতই আর-এক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে ও সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঠিক এর উল্টো-দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সিদ্ধান্তে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা ও ছন্দ যে তাকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধহয় আর কেহই লিখিতে পারেন নাই।"[১৫] কিন্তু এত কথা বলার পরেও যে তিনি মন্তব্য করেছেন, "তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত",[১৬] তার কারণ আর কিছুই নয়, 'চিত্রাঙ্গদা'র বিষয়বস্তু তাঁর কাছে অশ্লীল ঠেকেছিল। অর্থাৎ সেই নূতন বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেননি।

বুঝতে না-পারার মূলে রয়েছে সংস্কার, রয়েছে অভ্যাস, রয়েছে সাহিত্যবিচারের প্রচলিত মানদণ্ডের প্রতি আসক্তি।

এতক্ষণ সেই আসক্তির কথা বলেছি। এবারে বলা দরকার যে, পুরাতনের প্রতি আসক্তির অবসানও মাঝে-মাঝে ঘনিয়ে ওঠে। একদিকে যখন পুরনো অভ্যাস আর পুরনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরি আমরা, অন্যদিকে তখন নূতন

১৫. ১৬. সাহিত্য, ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

সম্পর্কে একটা আগ্রহবোধও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। যেমন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে, তেমনি সাহিত্য সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। নইলে সাহিত্যের অগ্রগতি কবেই স্তব্ধ হয়ে যেত। জীবনের আর-পাঁচটা ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই পাঁচালি আর মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতুম আমরা। তার চেয়ে নবীন কিছুকে আমরা গ্রহণ করতুম না।

নবীন মাত্রেই যে গ্রাহ্য কিংবা বরণীয়, তা অবশ্য নয়। সাহিত্যেও নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কোনো-একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি, সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত",[১৭] তখন তাঁর এই কথাটাকে মেনে না নেবার কোনও কারণই দেখতে পাই না আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে বলি, কোনও কিছু নিতান্ত নূতনতার কারণেই যেমন গ্রাহ্য নয়, তেমনি আবার নূতন বলেই যে সে বিনাবাক্যে বর্জনীয়, তাও নয়। আসল কথা, অভ্যাসের দাসত্ব কাটিয়ে তাকে বিচার করে দেখা চাই।

বিচার করবার জন্যই দরকার হয় নূতন মানদণ্ডের। নূতনের প্রতি আমাদের আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সেই মানদণ্ড ক্রমে গড়েও ওঠে। বাংলা সাহিত্যেও গড়ে উঠেছে। নইলে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই আমরা আটকে থাকতুম, রবীন্দ্রকাব্যের আহ্বানে আর এত বিপুলভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না। প্রখ্যাত একজন বাঙালি সমালোচকের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বাঙ্গালী সাহিত্যিক যেমন একদিকে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী সমালোচকও এই নবজাত সাহিত্যের রসাস্বাদন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত...নূতন মানদণ্ড উদ্‌ভাবন করিয়াছে।"[১৮]

উদ্‌ভাবনা যে অসম্ভব হয় না, তার কারণ, নূতন সাহিত্য, নূতন কবিতা সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার যে বাধা, কিছুকালের জন্য তার কাছে নতি স্বীকার করলেও, শেষ পর্যন্ত তাকে আমরা জয় করতেও পারি। যদি বলি, কবিতার অগ্রগতির প্রতি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের যে ইতিহাস, এক হিসেবে তা কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার বাধাগুলিকেই বারবার পেরিয়ে আসবার ইতিহাস, তা হলে নিশ্চয় বাড়িয়ে বলা হবে না।

১৭. সাহিত্যরূপ। 'সাহিত্যের পথে'।
১৮. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ-পরিচিতি। 'সমালোচনা সাহিত্য'।

কবিতা কীভাবে

কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠে কবিতা? অর্থাৎ একটি শব্দের আহ্বানে কীভাবে আর-একটি শব্দ তার পাশে এসে দাঁড়ায়, কোনও দৃশ্য উক্তি পরিস্থিতি কিংবা ঘটনা সম্পর্কে কবির অনুভূতি কিংবা মানস প্রতিক্রিয়া কীভাবে পরস্পরের-সঙ্গে-অবিচ্ছেদ্যভাবে-আবদ্ধ শব্দমালার মধ্য দিয়ে উন্মীলিত হতে থাকে, সেই শব্দমালা কীভাবে—ভিতর থেকে ঠেলা খেয়ে—একটি পঙ্‌ক্তি থেকে আর-একটি পঙ্‌ক্তিতে গড়িয়ে যায়, দশ বিশ তিরিশ কি পঞ্চাশটি পঙ্‌ক্তির সমবায়ে কীভাবে গড়ে ওঠে একটি ফ্রেম, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবনার মুখশ্রী কীভাবে উঁকি দেয়—এই প্রশ্নের উত্তর জানা কি একান্তই জরুরি?

আমাদের সংশয় ঘটছে এইজন্যে যে, কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য না হয় আহরণ করা গেল, কিন্তু সেই তথ্যগুলিকে যে কোনও ব্যবহারিক কাজে আমরা লাগাতে পারব, এমন সম্ভাবনা নাস্তি। একটি দেশ যে আর-একটি দেশে গুপ্তচর পাঠায়, তার গবেষণাগারে গিয়ে উঁকি দেয়, চুরি করতে চায় তার নবতম নির্মাণের ব্লু-প্রিন্ট, জেনে নেবার চেষ্টা করে যে, দ্বিতীয় দেশটি কীভাবে তৈরি করেছে তার সর্বাধুনিক ডুবোজাহাজ, তার কারণ ডুবোজাহাজের নির্মাণ-প্রক্রিয়ার রহস্যটাকে বুঝতে পারলে সে নিজেও ঠিক সেইরকমের একটি ডুবোজাহাজ বানিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কি সেটা সম্ভব?

ধরা যাক, কবিতা যেখানে তৈরি হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে উঁকি দিলুম আমরা, বুঝে নিলুম যে, কোন্ পশ্চাৎপট থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার প্রেরণা, কিংবা কোন্ দৃশ্য উক্তি পরিস্থিতি কিংবা ঘটনা উশকে দিয়েছে তার ভাবনাকে, জেনে নিলুম যে, ভাবনা কীভাবে শব্দের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, এবং ধ্বনি ছন্দ উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে পরিগ্রহ করছে একটি সুন্দর, সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল, সংহত মূর্তি। ধরা যাক, এই সবই আমরা করলুম, এবং এইভাবে বিস্তর জ্ঞানও অর্জন করলুম আমরা। কিন্তু এই যে জ্ঞান, এটা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?

সত্যি বলতে কী, যাকে আমরা কবিতা বলি, সেই নির্মাণকর্মের কোনও ব্লু-প্রিন্ট যদি থাকত, তবে সেটাও আমাদের কাজে লাগত না। ডুবোজাহাজ কি ইস্পাত-কারখানা কি তৈল-শোধনাগারের ব্লু-প্রিন্ট দেখে একেবারে আদ্যন্ত সেইরকম আর-একটি ডুবোজাহাজ কি ইস্পাত-কারখানা কি তৈল-শোধনাগার বানিয়ে নেওয়া যায়, এবং এই বানিয়ে নেওয়াটা যে পণ্ডশ্রমের ব্যাপার হয় না, তার কারণ, দ্বিতীয়টি যদিও ছাঁচে-ঢালা অনুকরণ মাত্র, তবু প্রথমটির মতোই সে কাজে লাগে। কবিতার ব্যাপারে কিন্তু ব্লু-প্রিন্ট কোনও কাজে লাগে না। কেননা, ছাঁচে-ঢালা হুবহু অনুকৃতির কোনও চাহিদা অথবা সমাদর এক্ষেত্রে নেই। এবং একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, শুধু কবিতা নয়, সবরকমের শিল্প সম্পর্কেই এ-কথা সত্য। মিকায়েলেঞ্জেলোর 'প্লাবন', রঁদার 'ভাবুক', কিংবা মোৎসার্টের 'ফিগারোর বিবাহ' (মোৎসার্টের জীবদ্দশায় যা কিনা 'জার্মন আবর্জনা' বলে নিন্দিত হয়েছিল) যে বারেবারে আমাদের আগ্রহ আকর্ষণ করে, এবং আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগায়, তার একটা মস্ত কারণ অবশ্যই মৌলিকতা। কবিতার প্রসঙ্গে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের "পৃথিবী" কিংবা জীবনানন্দের "সিন্ধুসারস" যদি না মৌলিক সৃষ্টি হত, তবে প্রথম পাঠের সঙ্গে-সঙ্গেই ওই কবিতা দুটি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অবসান ঘটত, দ্বিতীয়বার আর তাদের কাছে আমরা ফিরে যেতুম না।

বলা বাহুল্য "পৃথিবী" ও "সিন্ধুসারস" কবিতার ভিতরেও লুকিয়ে রয়েছে দুইরকম ভাবনা ও দুইরকম শব্দ-শিল্পের দুটি নকশা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই নকশা দুটিকে খুঁজে নিতে পারলেই, এবং কোন্ কোন্ মালমশলার কতটা মিশেল ঘটিয়ে কীভাবে সেই নকশার উপরে গড়ে তোলা হয়েছে অবিনশ্বর দুটি কবিতা, সেটা বুঝে নিতে পারলেই কি আমরাও, ঠিক ওই রকমেরই মৌলিক, দুটি নতুন কবিতা গড়ে তুলতে পারব? তা আমরা পারব না। মৌলিক নকশার ভিত্তিতে আমরা, বড়জোর, নকল "পৃথিবী" ও নকল "সিন্ধুসারস" বানাতে পারি। কিন্তু মূল "পৃথিবী" ও মূল "সিন্ধুসারস" যখন অলভ্য নয়, তখন সেই নকল নির্মাণ দুটি কার কোন্ কাজে লাগবে?

সুতরাং প্রশ্ন উঠবে যে, কবিতার জন্মরহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তবে আর আমাদের লাভ কী? কী লাভ তার সাজঘরে উঁকি দিয়ে? তার নেপথ্যবর্তী ইতিহাসের সন্ধান নিয়ে? তার পশ্চাৎপট, উপকরণ, মিশ্রণ-ক্রিয়া অথবা শারীর সন্ধিবিদ্যা সম্পর্কে খুঁটিনাটি নানা খবর জেনে? লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি আমরাও না মৌলিক কিছু কবিতা বানিয়ে তুলতে পারি, তবে আর জেনে

আমাদের কোন্ চতুর্বর্গ ফললাভ হবে যে, কোন্ কবি তাঁর মৃত্যুঞ্জয় কোন্ কবিতাটিকে ঠিক কীভাবে বানিয়ে তুলেছিলেন, কিংবা কোন্ দৃশ্য ঘটনা অথবা পরিস্থিতি থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা?

উত্তরে শুধু একটা কথাই আমরা বলতে পারি। সেটা এই যে কবিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য যখন আমরা পেয়ে যাই, তখন সেই তথ্যগুলি, কবিতা রচনার ব্যাপারে না হোক, কবিতা উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। আমরা যখন জানতে পারি যে, কোন্ পশ্চাৎপট কীভাবে একজন কবির চিত্তকে স্পন্দিত করে ও সৃষ্টিকর্মের দিকে তাঁকে এগিয়ে দেয়, এবং কীভাবে একজন কবির হাতে তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা, তখন, এক হিসেবে, তাঁর মানস প্রক্রিয়ার সঙ্গেই আর-একটু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে যায় আমাদের, এবং, তার ফলে, আর কিছু না হোক, তাঁর পাঠক হিসেবে আমরা আরও খানিকটা সমর্থ হয়ে উঠি। অন্যদিকে, আমরা যখন জেনে যাই যে, একই বিষয়ে এবং একই সময়ে তিন জন কবি, শেলি কিট্স ও লে হান্ট, যে তিনটি কবিতা রচনা করেছিলেন,[১] তার পিছনে আন্তর কোনও তাগিদ অথবা স্বাভাবিক কোনও অনুপ্রেরণা কাজ করেনি, ওটা আসলে পরস্পরের সঙ্গে চুক্তি করে কবিতা লেখার ব্যাপার মাত্র, তখন কবিতার অন্তরালবর্তী এই সংবাদটুকুও পাঠক হিসেবে কিছু-না-কিছু সাহায্য করে আমাদের। আর-কিছু না হোক, আমাদের বুঝে নিতে সাহায্য করে যে, তিনটি কবিতার একটিও কেন স্বচ্ছন্দভাবে উন্মীলিত হয় না, এবং অন্তত দুটির—শেলি ও কিট্সের কবিতার—ভাবনাসূত্র কেন ঠিকমতো বিস্তারিত হবার আগেই অতর্কিতে ছিঁড়ে যায়।

কবির সঙ্গে তাঁর পাঠকের সম্পর্ক আসলে স্রষ্টা ও ভোক্তার। কবি স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন, আর আমরা, পাঠকেরা, সেই সৃষ্টির রস আস্বাদন করছি। কিন্তু এই সহজ সত্যটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যেমন সৃষ্টিকর্মের জন্যে, তেমনি সেই সৃষ্টিকে শনাক্ত করে তার রস আস্বাদনের জন্যেও একটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার। বস্তুত, সমস্ত পাঠকের প্রস্তুতি সমান নয় বলেই তাঁরা দুই সৃষ্টির তারতম্যকে চিনে উঠবার ব্যাপারে যেমন সমপরিমাণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না, অন্যদিকে তেমন তাঁদের আস্বাদন অথবা সম্ভোগের মাত্রাতেও

১. তিনটি কবিতারই বিষয়বস্তু হল 'নীল নদ'। রচনার কিছুদিন বাদে কিট্স তাঁর ভাইকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "The Wednesday before last (Feb. 4, 1818) Shelley, Hunt and I wrote each a sonnet on the river Nile."

অল্পবিস্তর তারতম্য ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথের "হৃদয়-যমুনা" থেকে একজন পাঠক যতটা রস নিষ্কাশন করে নেন, আর-একজন পাঠক ঠিক ততটাই নিতে পারেন না। জীবনানন্দের "হাওয়ার রাত"-এর মধ্যে একজন পাঠক ঠিক ততটাই ডুবে যেতে পারেন না, আর-একজন পাঠক যতটা পারেন। তার রহস্য, ব্যঞ্জনা কিংবা ইঙ্গিতগুলি হয়তো একজন পাঠকের কাছে ততটাই ধরা পড়ে না, আর-একজন পাঠকের কাছে যতটা পড়ে। দুই পাঠকই ভোক্তা, কিন্তু দুজনের সম্ভোগের প্রকৃতি ও মাত্রায় কিছু-না-কিছু ব্যবধান যে ঘটে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, তাঁদের প্রস্তুতির তারতম্য। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, পাঠক হিসেবে যাঁর প্রস্তুতি যত বেশি, তিনি তত যোগ্য পাঠক। এই অর্থে যোগ্য যে, কবিতার গুণ-বিচার ও রস-সম্ভোগের ব্যাপারে, অন্য অনেকের তুলনায়, নিজেকে তিনি আরও বেশি পরিমাণে তৈরি করে তুলেছেন।

তৈরি হওয়ার প্রসঙ্গে একটি বিদেশি প্রাজ্ঞবচনের কথা আমাদের অনেকেরই মনে পড়তে পারে। তাতে বলা হয়েছে যে, কবিরা কবি হয়েই জন্মান, তাঁদের তৈরি করে তোলা যায় না।[২] এই উক্তির মধ্যে অর্জিত ক্ষমতার উপরে আদৌ জোর পড়ছে না, সমস্তটুকু জোর পড়ছে সহজাত শক্তির উপরে। বলা হচ্ছে যে, যিনি কবি, তিনি তাঁর সহজাত শক্তির কারণেই কবি। অর্থাৎ কাব্যরচনার শক্তি হচ্ছে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু তাই বলে যে পুরোপুরি সত্য, তা নয়। একজন কবির জীবনের যেটা সূচনাপর্ব, সহজাত ক্ষমতার একটা মস্ত ভূমিকা সেখানে রয়েছে বটে, কিন্তু পরবর্তী পর্বগুলিতে— অর্থাৎ সেই কবির দৃষ্টিকোণ যখন ক্রমশ পালটে যাচ্ছে, নানান বস্তু অথবা বিষয় সম্পর্কে বদলে যাচ্ছে তাঁর ভাবনা, ভাষার বিবর্তন ঘটছে, এবং একটু-একটু করে নিজেকে ভাঙতে-ভাঙতে যখন আবার নতুন করে নির্মাণ করে নিচ্ছেন তিনি, তখন—তাঁর অর্জিত ক্ষমতার ভূমিকাও বেশ বড় হয়েই দেখা দেয়। সত্যি বলতে কী, যে-কবি শুধু সহজাত ক্ষমতার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল, সারা জীবন যেন শুধু একই ভাবনা আর একই ভাষার উপরে দাগা বুলিয়ে-বুলিয়ে লিখে যান তিনি, যে-ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন, তার ক্ষেত্রকে আর বাড়িয়ে নেন না বলেই তাঁর কবিতারও আর বিশেষ-কোনও পরিবর্তন ঘটে না, কবি হিসেবে তিনি আর বেড়ে ওঠেন না। অন্যদিকে, কবি হিসেবে আমৃত্যু যিনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছেন না, ক্রমাগত উত্তীর্ণ হতে চাইছেন ও উত্তীর্ণ

২. "Poeta nascitur, non fit."

হয়ে যাচ্ছেন ভাবনা ও ভাষার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, অর্থাৎ নিজেকে যিনি ক্রমেই আরও ব্যাপ্ত, বিকীর্ণ ও বিকশিত করছেন, এবং—ধারাবাহিক এই উন্মীলনের ফলেই—নূতন প্রজন্মের পাঠকের কাছেও যাঁর কবিকর্মের রেলিভ্যান্‌স বা প্রাসঙ্গিতা চট্‌ করে ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুই সহজাত ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেননি, ক্রমাগত তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাঁর অর্জিত ক্ষমতাকে, এবং এইভাবে তাঁর তূণীরের অস্ত্রসংখ্যা তিনি দিনে-দিনে আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন। এক কথায় বলতে পারি, কবি হিসেবে নিজেকে তিনি ক্রমেই আরও বেশি মাত্রায় তৈরি করে তুলেছেন।

ঠিক তেমনই, পাঠকেরও দরকার হয় নিজেকে যথাসম্ভব তৈরি করে তুলবার। এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আমরা আরও বলেছি যে, যেমন কবিতা-রচনার জন্য, তেমন তার রস-সম্ভোগের জন্যও কিছু ক্ষমতা ও প্রস্তুতি থাকা চাই। যা কিনা সকলের থাকে না। আবার, যাঁদের থাকে, তাঁদেরও সেই সম্ভোগ-ক্ষমতার সবটুকুই যে সহজাত, তা নয়। তাঁদের খানিকটা রসবোধ জন্মসূত্রে লব্ধ অবশ্যই, কিন্তু বাকিটুকু তাঁদের অর্জন করে নিতে হয় ; এবং এই অর্জনের পরিমাণ যে-পাঠকের যত বেশি, কবিতা থেকে তত বেশি পরিমাণে রস আহরণ করে তাঁর নান্দনিক ক্ষুধা তিনি মিটিয়ে নিতে পারেন।

কবিতা কীভাবে, এই প্রসঙ্গের একেবারে সূচনায় যে এত কথা আমাদের বলতে হল, তার কারণ আর কিছু নয়, গোড়াতেই এই বক্তব্যকে আমরা পরিষ্কার করে নিতে চাইছি যে, একটি কবিতাকে—তার জন্মসূত্র অথবা পশ্চাৎপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, এবং তার গঠন-কৌশলের রহস্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী না হয়ে—একেবারে সরাসরি পাঠ করবার মধ্যেও আনন্দ আছে অবশ্যই, কিন্তু তার জন্মসূত্র অথবা পশ্চাৎপটেরও কিছু আভাস যখন আমরা পাই, এবং, উপরন্তু, জানতে পারি যে, ঠিক কীভাবে সেটি—কিংবা তার অংশবিশেষ—তৈরি হয়ে উঠেছিল, তখন, বলা বাহুল্য, সেই কবিতার সঙ্গে, সাধারণ একজন পাঠকের তুলনায় আর-একটু বেশি ঘনিষ্ঠতার সূত্রে যুক্ত হই আমরা, এবং, তারই ফলে, সেই একই কবিতা থেকে আর-একটু বেশি আনন্দ আমরা নিষ্কাশন করে নিতে পারি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষপর্বের প্রতীক হিসেবে যে কবিতাটিকে অনেকে চিহ্নিত করতে ভালবাসন, সেই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর কথাই ধরা যাক।[৩] ঠিক কীভাবে ও কোন্‌ চেহারা নিয়ে যে এই কবিতাটি তৈরি হয়ে

উঠেছিল, তা আমরা জানি। আমরা এও জানি যে, একবার তৈরি হয়ে উঠবার পরে নানা সময়ে এর নানা সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, কোন্ পশ্চাৎপট থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এর অনুপ্রেরণা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা খুব স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়ে গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের সমস্ত আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"[৪] সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে ও ভাসিয়ে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি যেন নির্ঝরের মতোই তাঁর চিত্ত থেকে সেদিন উৎসারিত হয়ে আসে।

এই যে পশ্চাৎপট, এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও এই কবিতাটি আমরা পড়তে পারি। বলা বাহুল্য, বাল্যে, কৈশোরে ও প্রথম-যৌবনে আমরা প্রায় সকলেই তা-ই পড়েছি, মধ্য-কলকাতার একটি অলৌকিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই কবিতার যোগসূত্রের কথা আমাদের কারও তখন জানা ছিল না। কিন্তু তাই বলে যে এই কবিতা থেকে আদৌ কোনও আনন্দ আহরণ করা আমাদের পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি, তাও নয়। (বস্তুত, অনেক বয়স্ক পাঠকও পশ্চাৎপটের কোনও খবর না-রেখেই অদ্যাবধি এই কবিতাটি পড়ে থাকেন, এবং তাতেও তাঁদের চিত্তে নিতান্ত কম আনন্দের সঞ্চার হয় না। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মধ্যে যে একটি বিমুক্ত উল্লাসের বার্তা ও ব্যঞ্জনা রয়েছে, স্বতই তাঁদের চিত্ত তাতে স্পন্দিত, ঝংকৃত হয় ; এর দ্রুতলয় ছন্দ ও ধ্বনিগত ঐশ্বর্যের উন্মাদনাও খুব সহজেই

৩. অন্য আরও অনেক কবিতা নিয়েই এক্ষেত্রে আলোচনা করা যেত, কিন্তু আপাতত সেগুলিকে সরিয়ে রেখে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর উপরেই যে চোখ রাখছি আমরা, তার কারণ, এই কবিতাটির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত; ফলে, যে-অনুপ্রেরণা এই কবিতাটির পিছনে কাজ করেছিল, এবং যে নির্মাণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কবিতাটি তৈরি হয়ে উঠেছে, তার তাৎপর্যকে ধরতে পারা আমাদের সকলের পক্ষেই সহজ হবে।

৪. 'জীবনস্মৃতি'।

তাঁদের ভাসিয়ে নেয়।) কিন্তু এর পশ্চাৎপটের খবর যখন আমরা জেনে যাই, এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে এই কবিতাটিকে যখন আবার নতুন করে পড়ি আমরা, তখন যে এর মধ্যে নতুন আর-একটি মাত্রা বা ডাইমেনশন আমরা খুঁজে পাই, তাও স্বীকার্য। বস্তুত, সেই মাত্রাটিকে খুঁজে পাবার ফলেই এই কবিতা আমাদের কাছে আরও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্যের সামগ্রিক পটভূমিকার উপরে স্থাপন করে এই কবিতাটিকে তখন আমরা দেখতে শিখি, এবং একমাত্র তখনই এর যথার্থ গুরুত্ববিচার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

গুরুত্ব যে কতখানি, দু'দিক থেকে সেটা বিচার্য। প্রথমে এর ভাবনার উপরে চোখ রাখা যাক। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর প্রেরণা কী-ভাবে এসেছিল, একটু আগে স্বয়ং কবির কাছেই তা আমরা শুনলুম। প্রসঙ্গত, তিনি আমাদের বলেছেন যে, তাঁর "হৃদয়ে স্তরে স্তরে" তখন একটা "বিষাদের আচ্ছাদন" ছিল। শুনে আমাদের মনে স্বতই একটি প্রশ্ন জাগে। তাঁর শব্দরুচি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সতর্ক ছিল বলেই আমরা জানতে ইচ্ছুক হই যে, 'আচ্ছাদন' শব্দটিকে এখানে কেন ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ? তবে কি এই শব্দটি ব্যবহার করে তিনি এটাই আমাদের জানিয়ে দিতে চান যে, ইতিপূর্বে-রচিত তাঁর কবিতাবলির মধ্যে যে-ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল আমাদের, বস্তুত তা ভিতর-থেকে-ঘনিয়ে-ওঠা কোনও বিষাদভাবনা নয়, নেহাতই সুপার-ইম্‌পোজ্‌ড বা বাইরে থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া একটা আবরণ মাত্র? অর্থাৎ তাঁর মানস প্রবণতার সঙ্গে সেই বিষাদের কোনও স্বাভাবিক যোগসম্পর্ক ছিল না? রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে—অন্তত তখনও পর্যন্ত—দুঃসহ কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটেনি, সে-কথা জানবার পরে আমাদের সন্দেহটা, বলা বাহুল্য, আরও শক্ত রকমের একটা ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে যায়, এবং তার পরে যখন আবার নতুন করে ওই 'আচ্ছাদন' শব্দটির উপরে আমরা চোখ রাখি, তখন আমরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে জেনে যাই যে, 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ যে বিষণ্ণ সুর আমরা শুনেছিলুম, তার মূলে কোনও সত্যিকারের বিষাদ ছিল না, সেই সুর আসলে প্রথম তারুণ্যের বিষাদবিলাস থেকে উদ্ভুত।

বানিয়ে-তোলা এই বিষাদের দুর্গ থেকেই বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উত্তীর্ণ হতে চাইছিলেন তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভূমিতে, শোনাতে চাইছিলেন—সর্বজনের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকার নয়—সর্বজনের সঙ্গে যুক্ত হবার বার্তা, যে-বার্তা আমরা জানি যে, অতঃপর সারা জীবন ধরে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি শুনিয়ে যাবেন। কিন্তু এই চাওয়ার সঙ্গে যদি সদর স্ট্রিটের বারান্দা থেকে দেখা সেই বিখ্যাত সূর্যোদয়কে আমরা

কার্যকারণের সূত্রে গেঁথে গ্রহণ করি, তবে সেটাও সম্ভবত ঠিক হবে না। কেননা, যার সঙ্গে সেই সূর্যোদয়কে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর পশ্চাৎপটকে আর-একটু ভালভাবে বুঝে নেবার তাগিদে আরও একটু পিছনে ইতিমধ্যে চোখ রেখেছি আমরা, এবং তারই ফলে দেখতে পাচ্ছি যে, বিষাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার এই যে বাসনা, 'সন্ধ্যাসংগীত'-এরও নানাস্থানে এটা একেবারে অপ্রকট নয়। সেখানেও একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

"জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য গেল তোর গ্রহ তারা
গেল তোর আত্ম আর পর।
এইবেলা প্রাণপণ কর।
এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিসনে আর।"[৫]

এবং আর-একটি কবিতায় :

"আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম
ফিরে নেব কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবিশশীতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর ঊষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।"[৬]

এমন-কী, 'প্রভাতসংগীত'-এর একেবারে প্রথম কবিতাটিতেও নিজের-গড়া কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সর্বজনের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনা অতিশয় প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেখানেও আমরা বলতে শুনি :

৫. পরাজয়-সংগীত। 'সন্ধ্যাসংগীত'।
৬. সংগ্রাম-সংগীত। 'সন্ধ্যাসংগীত'।

"মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।
... ...
আর কতদিন কাটিবে এমন,
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া যায়।"[৭]

শুনে আমাদের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না যে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মধ্যে যে-বিস্ফোরণের চিত্র দেখি আমরা, সেটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। বুঝতে পারি যে, বিষাদের যে অবরোধ তিনি তাঁর নিজের হাতেই বানিয়ে তুলেছিলেন, তাকে চূর্ণ করবার বারুদও ইতিমধ্যে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল তাঁর মনের মধ্যে। সদর স্ট্রিটের সূর্যোদয়কে সেদিক থেকে একটি অনিবার্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলে গণ্য করতে পারি আমরা,—বারুদের ওই স্তূপের সঙ্গে সহসা যার সংযোগ ঘটে যায়।

অতঃপর বিস্ফোরণ। পাহাড়ে ফাটল ধরেছে, রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রমত্ত জলধারা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মধ্যে একদিকে যখন সেই বিশাল নিষ্ক্রান্তির গর্জন শুনি আমরা, তখন, অন্যদিকে, তার অমোঘ তাৎপর্যেরও একটা ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বিস্ফোরণ না-ঘটলেই কি রবীন্দ্রনাথের মুক্তিবাসনা ব্যর্থ হয়ে যেত, এবং, কবি হিসেবে, আমৃত্যু তাঁকে বন্দি হয়ে থাকতে হত আপন-হাতে-বানিয়ে-তোলা বিষাদের দুর্গের মধ্যে? তা নিশ্চয় নয়। এ-কথা বলবার কারণ এই যে, সদর স্ট্রিটের সেই সূর্যোদয়—একটু আগেই যাকে আমরা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছি—আসলে একটি প্রতীক মাত্র, এবং ভিতরে-ভিতরে যে-ভাবে তিনি তৈরি

৭. আহ্বান-সংগীত। 'প্রভাতসংগীত'।

হয়ে উঠেছিলেন, তাতে—ঠিক সেদিন না-হলেও—অচিরকালের মধ্যে ওই রকমের আর-একটি শুভপ্রতীক সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হতই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই একটা মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যেত আমাদের যে, অবিস্মরণীয় ওই কবিতাটি সেক্ষেত্রে আর লেখাই হত না।

কেন হত না, সেটা বুঝতে হলে দুই ধরনের কবিতার পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। এক ধরনের কবিতা লেখা হয় আবেগের অভিঘাত কেটে যাবার পরে ; তার মধ্যে বস্তুত আবেগের সেই অভিঘাতকেই আবার ধীরেসুস্থে নতুন করে বানিয়ে তোলা হয়। "...ইমোশান রিকালেকটেড ইন ট্রাংকুইলিটি"—কবিতা-নামক ব্যাপারটার রচনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদেশি কবির এই যে উক্তি,[৮] এটি আসলে এই ধরনের কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আর এরই অন্য প্রান্তে রয়েছে কোলরিজের "কুবলা খান" ও রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মতো কবিতা, কবিকে যা তাঁর আবেগের চেহারা ও চরিত্রকে ঠিকমতো বুঝে নেবারও সময় কিংবা সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ এ-সব কবিতা কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরেসুস্থে তৈরি হয়ে ওঠে না, প্রবল কোনও ঘটনা অথবা উপলব্ধির অভিঘাতে কবি যখন মুহ্যমান, তখন, তাঁর সেই বিবশ ও আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই, জন্ম নেয়। যা ঠিক সেই মুহূর্তে সেই অবস্থার মধ্যে রচিত না-হলে আর কোনও-দিনই রচিত হয় না, চিরকালের মতোই হারিয়ে যায়।

কিন্তু সে-কথা থাক। আসল কথাটা এই যে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" যে শুধু ভাবনার দিক থেকেই তাৎপর্যময় একটি কবিতা, তা নয়, তার গঠন-তাৎপর্যও লক্ষ করবার মতো। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, যে-চেহারায় এই কবিতাটি তৈরি হয়ে উঠেছিল, পরে নানা সময়ে তার অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়। মূল পাঠে এর পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ছিল আড়াইশোরও বেশি। একটি পরিবর্তিত পাঠে—যে-পাঠ আমরা 'সঞ্চয়িতা'য় পাই, এবং ভিন্নপ্রকার দাবি সত্ত্বেও যাকে চূড়ান্ত পাঠ বলে গণ্য করবার সংগত কারণ বর্তমান—সেই সংখ্যা তেতাল্লিশে নেমে আসে। সেইসঙ্গে, কিছু-কিছু পঙ্‌ক্তির বিন্যাসও কবি পালটে দেন।[৯]

৮. 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'-এর মুখবন্ধে ওয়র্ডসওয়র্থ কবিতাকে "Spontaneous overflow of powerful feelings" হিসেবেই দেখেছিলেন বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বলেছিলেন... "...it takes its origin from emotion recollected in tranquillity."

৯. মূল পাঠের কোনও শব্দ যে পরে পালটে যায়নি, তাও নয়। আগে যা ছিল 'প্রাণের বাসনা', পরে তা হয়েছে 'প্রাণের বেদনা'।

পরিবর্জন ও পরিবর্তনের কারণ কী, সেটা অনুমান করা অবশ্য শক্ত নয়। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, একদিকে এর বিস্তর পঙ্‌ক্তি ছেঁটে দিয়ে ও অন্যদিকে এর পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিকে আরও ঋজু ও সংহত করে তুলতে চাইছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কী চমকপ্রদভাবে সফল হয়েছিল, মূল পাঠের সঙ্গে 'সঞ্চয়িতা'র এই পরিবর্তিত পাঠকে মিলিয়ে নিলেই সেটা ধরতে পারা যায়। মূল পাঠের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য ; কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, তার বিন্যাস খুবই শিথিল। পরিবর্তিত পাঠে সেই শৈথিল্য আমাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে যে শুধু সংহতিই তিনি অর্জন করতে চাইছিলেন, তা হয়তো নয়। হয়তো এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরও বড় ও আরও অর্থবহ একটি লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে চাইছিলেন। কথাটা আমরা এইজন্যে বলছি যে, মূল পাঠ পড়ে নেবার পরে যখন 'সঞ্চয়িতা'য় প্রকাশিত এই সংশোধিত পাঠ আমরা পড়তে বসি, তখন, একেবারে সূচনাতেই, একটা ব্যাপার আমাদের চমকে দেয়। আমরা দেখতে পাই যে, মূল পাঠে যা ছিল অনেক পরে, সেই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে কবিতাটির একেবারে গোড়ায় নিয়ে এসেছেন তিনি, ফলে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর ভিতরকার সংঘাত, বিস্ময়, আলোড়ন ও উল্লাস একেবারে সূচনা থেকেই এর শব্দধ্বনির মধ্যে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। ভাবনার সঙ্গে ধ্বনির এই যে সংগতি, প্রথম পাঠের সূচনায় এটা একেবারেই ছিল না।

সংশোধিত পাঠের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ যে কোন্ কৌশলে এই সংগতিকে অর্জন করে, একটু বাদেই সেটা আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। তার আগে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর ছন্দ নিয়ে এখানে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা দরকার। এই কবিতার যেটি মূল পাঠ, সূচনার অংশে স্পষ্টভাবে ধরা না গেলেও, খানিক বাদেই বোঝা যায় যে, সেটি অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে লেখা। 'সঞ্চয়িতা'য় প্রকাশিত সংশোধিত পাঠটি কিন্তু আদ্যন্ত মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের চালে চলে। অর্থাৎ পাঠ-সংশোধনের সময়ে অক্ষরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ সমূহ বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন, সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। অক্ষরবৃত্তের চাল মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অনেক মন্থর। ফলে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই কবিতার ভাবনার মধ্যে যে একটা সংঘাতময় তীব্র গতির দ্যোতনা রয়েছে, অক্ষরবৃত্তে তাকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না, কবিতার ভাবনা ও চলনে একটা বিরোধ ঘটে যাবে।

কিন্তু "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মূল পাঠের, সবটা না হোক, গোড়ার দিকের

বেশ-খানিকটা অংশ যে মাত্রাবৃত্তের চালেই পড়া যায়,[১০] তাও স্বীকার্য। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে যে, পাঠ-সংশোধনের সময়ে কেন সেই অংশ নিয়েও আপত্তি হল রবীন্দ্রনাথের? কেন সূচনার পঙ্‌ক্তিগুলিকে বর্জন করলেন তিনি, এবং সেই জায়গায় কেন পিছনের একটি পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে এনে বসিয়ে দিলেন? একটু বাদেই অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা। প্রথম পাঠের সূচনার সঙ্গে যখন সংশোধিত পাঠের সূচনাকে আমরা মিলিয়ে দেখি, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রথম পাঠের সূচনা ছিল এইরকম :

"আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ
কী গান গাইল রে!
অতিদূর দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে!"

এই যে পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়, টানা দুটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতেও আমরা এদের সাজিয়ে নিতে পারি। তখন এদের চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :

"আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ কী গান গাইল রে!
অতিদূর দূর আকাশ হইতে ভাসিয়া আইল রে!"

বলা বাহুল্য, পঙ্‌ক্তির এই পুনর্বিন্যাসে ছন্দের কোনও হেরফের হবে না। কিন্তু এটা কোন্ ছন্দ? যদিও আমরা জানি যে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মূল পাঠ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই লেখা হয়েছিল তবু, আমরা আগেই বলেছি, তার এই সূচনার অংশকে মাত্রাবৃত্ত বলে ধরে নিতেও আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। ধরা যাক, এটা মাত্রাবৃত্তই। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দুই পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটিতে আছে ছ-মাত্রার তিনটি করে পর্ব ও এক-মাত্রার একটি করে ভাঙা-পর্ব। কিন্তু একে তো ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে কোনও সংঘাতের দ্যোতনা আনা খুবই শক্ত ব্যাপার, উপরন্তু পঙ্‌ক্তি-শেষে মুক্ত সিলেব্‌ল্ থাকার ফলে সেখানেও কোনও ধাক্কা বেজে ওঠে না, দুটি পঙ্‌ক্তিই একটা নিস্তরঙ্গ মসৃণতার মধ্যে এলিয়ে যায়।

১০. আমরা জানি যে, এই কবিতা যখন লেখা হয়, বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রশ্নাতীত প্রবর্তনা তখনও ঘটেনি। সেটা প্রথম ঘটে 'মানসী'র কবিতায়। তবে মাত্রাবৃত্তের চাল তার আগেও অনেক সময় কবিতার মধ্যে উঁকি দিয়ে যেত। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর যেটা মূল পাঠ, তার প্রথম দিকের বেশ খানিকটা অংশে যেমন দিয়েছে। পরের অংশে যখন আমরা যুক্তাক্ষরের সম্মুখীন হই, এবং দেখতে পাই যে, শব্দের মধ্যবর্তী যুক্তাক্ষরের আশ্রিত রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌কে দু-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তখন অবশ্য হোঁচট খেয়ে আমাদের বুঝে নিতে হয় যে, গোড়ার দিকে যা-ই মনে হয়ে থাকুক, এর ছন্দ আসলে সেই সনাতন অক্ষরবৃত্তই।

এই এলিয়ে-যাওয়ার আমেজটাকেই ঘুচিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পিছনের পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে যখন সামনে নিয়ে এলেন তিনি, তখন একেবারে সূচনা থেকেই গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এই কবিতা, ধ্বনির সঙ্গে সংগতি ঘটল ভাবনার, এবং নির্ঝরেরও তখন সত্যিকারের স্বপ্নভঙ্গ হল। এটা এইজন্যে হল যে, সংশোধিত পাঠের সূচনায় যে পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ আমরা পচ্ছি, তার গড়ন একেবারে অন্য ধাঁচের।

সংশোধিত পাঠের সূচনা এইরকম :

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমন পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"

এও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি এখানেও সেই ছ-মাত্রার তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব দিয়ে গড়া (ভাঙা-পর্বটি এক্ষেত্রে দু-মাত্রার)। কিন্তু পঙ্‌ক্তি-শেষে মুক্ত সিলেব্‌ল্-এর বদলে এখানে আছে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর পাঁচিল। ফলে, লাইন দুটি এক্ষেত্রে আদৌ এলিয়ে যাচ্ছে না, বরং রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এ আটকে গিয়ে বেশ জোরদার দুটি ধাক্কা তারা বাজিয়ে তুলছে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় জাদু রয়েছে প্রথমে দুটি পঙ্‌ক্তিতে, আগে থাকতেই যারা ওই ধাক্কার একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির গড়নটা লক্ষণীয়। তাদের প্রত্যেকটিকেই গড়া হয়েছে দুটি পর্ব দিয়ে। কিন্তু দুটি পর্বকে সমান মাপের রাখা হয়নি। একটি ছ-মাত্রার পর্ব, অন্যটি পাঁচ-মাত্রার। উপরন্তু দুটি পঙ্‌ক্তিরই প্রথম পর্বের শেষে আছে মুক্ত সিলেব্‌ল্ ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে আছে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, ছয়-পাঁচ ও স্বর-ব্যঞ্জনের টানাপোড়েনে একেবারে প্রথম থেকেই একটা সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়ে যায়। বস্তুত এই টানাপোড়েন যেন সেই রুদ্ধগতি জলস্রোতেরই এক-একটা ঘূর্ণির মতো, ছোট-ছোট পঙ্‌ক্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে যা এগিয়ে যায়, এবং বড় পঙ্‌ক্তির মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও তার মুক্তি নেই। প্রথম দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির শেষে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর পাঁচিল ডিঙিয়ে সে দ্বিতীয় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে নেমে আসে বটে, কিন্তু সেখানেও—পঙ্‌ক্তির শেষে—তাকে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এ প্রতিহত হতে হয়, এবং তখনই বেজে ওঠে আরও বড় রকমের একটা ধাক্কা। কবিতার স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন বা গঠনভঙ্গিই যেন কবিতার বিষয়বস্তুকে তার মুঠোর মধ্যে তখন ধরে নেয়; ভাবনায় ও ধ্বনিতে কোনও পার্থক্যই আর থাকে না।

অবরুদ্ধ জলস্রোতের চিত্রটি যে প্রতীকী, এবং সেই প্রতীকের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর নিজেরই কথা বলছেন, তা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা এও বুঝেছি যে, যা তিনি ভাঙতে চান, সেই অবরোধের প্রাকারও তাঁর নিজেরই হাতে নির্মিত। পরে আরও অনেক রচনায় অনেকভাবে তাঁকে আমরা নিজের-হাতে-বানিয়ে-তোলা অবরোধের কথা বলতে শুনব। 'রাজা'কে দেখব আত্ম-অবরোধের আড়ালে আশ্রয় নিতে। গানের মধ্যেও ধ্বনিত হবে আর্তি : "আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!" সেই আবরণকে আপন হাতে ছিন্ন করবারও মন্ত্রণা দেবেন তিনি। আহ্বান জানাবেন, স্বেচ্ছা-অবসৃতি বা নির্বাসনের পালা চুকিয়ে, অবরোধের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু ইতিমধ্যে যেহেতু "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এবং বড় একটি পটভূমির উপরে স্থাপনা করে এই কবিতাটিকে গ্রহণ করতে শিখেছি আমরা, তাই আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারব যে, পরবর্তী কালের এই মন্ত্রণা আর আহ্বান আসলে সেই একই থিম্ কিংবা ভাববস্তুর সম্প্রসারণ মাত্র, এর ক্ষেত্র অনেক আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-কে রবীন্দ্রনাথ যে কেন তাঁর "সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" বলে বর্ণনা করেন,[১১] এটাও বুঝে নিতে তখন আর আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

আর গঠন-ভঙ্গিমা? "ঝুলন" কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা বলতে শুনব, "এ-মহাসাগরে তুফান তোল্", এবং স্বকণ্ঠে আবৃত্তির সময়ে পঙ্‌ক্তিশেষের রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর উপরে যখন বারে-বারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি, তখনও আমরা ঠিকই বুঝতে পারব যে, কবিতার ধ্বনির ভিতর দিয়ে প্রলয়রোলের ব্যাপারটাকে বাজিয়ে তুলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আবারও সেই মাত্রাবৃত্তের ছয়-পাঁচ ও স্বরব্যঞ্জনের টানাপোড়েনকে কাজে লাগিয়েছেন, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মধ্যেই যার অসামান্য ক্ষমতার কথা তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন।

একটি কবিতাকে যে নানান দিক থেকে দেখতে হয়, নজর রাখতে হয় তার ইতিহাস ও উৎসের উপরে, এবং জেনে নিতে হয় তার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নানা রহস্য, সেটা এইজন্যেই। কিন্তু এইভাবে যখন একটি কবিতাকে আমরা দেখতে চাই, তখন

১১. "একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে!"—'জীবনস্মৃতির খসড়া'। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। পুলিনবিহারী সেন-প্রণীত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী', প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তার বিষয়বস্তু, ভাবনা, ভাষা ও শারীর সন্ধি-কৌশলগুলিকে যথাসম্ভব বিশ্লিষ্ট করে দেখতে হয় আমাদের। এবং, তারই ফলে, যা কিনা একটি অখণ্ড শিল্পবস্তু, তার জোড়গুলি যেন আমাদের চোখের সামনে তখন একে-একে খুলে যেতে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতার সামগ্রিক আস্বাদন ও উপলব্ধির পথে এটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি না। আমরা জানি যে, অনেকেই এটাকে মস্ত বাধা বলে গণ্য করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই পদ্ধতিকে খুব পছন্দ করেননি। সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়াসকে নিরুৎসাহিত করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "...কী সংগ্রহ করার জন্য বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি তার আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি।"[১২] আর ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচক বলছেন, "...those whose thinking and teaching go no farther than a knowledge and exposition of rhyme schemes, scansions, authors, story and even style of a poem are almost certainly missing the true essence of poetry."[১৩]

সন্দেহ নেই যে, একেবারে অমূলক নয় এই আশঙ্কা। গাছগুলিকে আমরা যখন আলাদা-আলাদা করে দেখে নিচ্ছি, তখন অরণ্য হয়তো সত্যিই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিক থেকে যখন এই সমস্যাটির দিকে তাকাই আমরা, তখন অন্য-একটি প্রশ্ন আমাদের চিত্তে এসে উঁকি দেয়। আমরা ভাবি যে, যে-পটভূমি থেকে, যে-যোগাযোগের ভিতর দিয়ে, যে-সমস্ত উপাদানের সমবায়ে তৈরি হয়ে উঠছে সেই সমগ্র, তার বিষয়ে যদি আমরা আদৌ উৎসুক না হই, তবে সমগ্রতার সম্পর্কেও আমাদের ধারণা কি নিতান্ত ঝাপসা থেকে যায় না?

বলা বাহুল্য, বিপদের আশঙ্কা রয়েছে দু'দিক থেকেই। আর তাই, দু'দিকেই চোখ রাখতে হবে আমাদের। অরণ্যকে ভালবাসি বলেই, এবং তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ করে নিতে চাই বলেই, চিনতে হবে তার ভূ-প্রকৃতিকে, তার বৃক্ষরাজিকে, তার পত্রপুষ্পকে। আবার একইসঙ্গে সজাগ থাকতে হবে যে, উপাদানগুলিকে যখন বিশ্লিষ্ট করে দেখছি আমরা, তখন সেই উপাদানগুলির সমবায়ে যা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই সামগ্রিক শিল্পবস্তুটি যেন আমাদের ভাবনা থেকে হারিয়ে না যায়। কেননা, সামগ্রিক শিল্পবস্তুটি তো বিভিন্ন উপাদানের যোগফল-মাত্র নয়। সত্যিই তার চেয়ে বেশি-কিছু, বড়-কিছু।

১২. সাহিত্য-বিচার। 'সাহিত্যের পথে'।

১৩. P. Gurrey. "The Appreciation of Poetry'.

কঠিন কবিতা

ইংরেজিতে এই রকমের একটি প্রাজ্ঞবচন আছে যে, কবিরা তাঁদের নিজেদেরই সঙ্গে কথা বলেন, আর আমরা, পাঠকেরা, আড়াল থেকে সেই কথাগুলি শুনে ফেলি। অর্থাৎ কবিতা আর কিছুই নয়, কবিদের স্বগত-সংলাপ মাত্র।

প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁদের সম্পর্কে এই উক্তি, সেই কবিরা এ-কথা মানেন কি না। মানলে, বলা বাহুল্য, গোল মিটে যায় ; অন্তত, কবিতা কেন কঠিন, পাঠকদের এই প্রশ্নের জবাব দেবার কোনও দায়-দায়িত্বই কবিদের তখন থাকে না। নিজের সঙ্গে কে কী কথা বললেন না-বললেন, তা নিয়ে তো কেউ কোনও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। কবিরাও নন। আর তাই, কবিতার কাঠিন্য নিয়ে পাঠকদের তরফে যদি কোনও নালিশ ওঠে, তো কবিরা খুব নির্বিকারভাবেই সেক্ষেত্রে বলতে পারেন, 'বাপু হে, আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম না, আমি কথা বলছিলুম আমার নিজেরই সঙ্গে। সেসব কথা শোনার জন্য কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দেয়নি। তবু তুমি আড়ি পেতে সেই কথাগুলো শুনতে গেলে কেন? তুমি তো আমন্ত্রিত অতিথি নয়, রবাহূত মানুষ। সুতরাং আমার নিজেরই উদ্দেশে উচ্চারিত কথা যদি তোমার কঠিন লেগে থাকে, তো তা নিয়ে নালিশ জানাবার কোনও অধিকারই তোমার নেই। যাই হোক, এর থেকে তোমার একটা শিক্ষা হওয়া উচিত। যে-কথা তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত নয়, ভবিষ্যতে আর কখনও তা তুমি শুনতে যেও না।'

পক্ষান্তরে, কবিরা তাঁদের কবিতাকে যদি নিতান্ত স্বগত সংলাপ বলে মেনে না নেন, অর্থাৎ যদি তাঁরা স্বীকার করেন যে, কবিতায় যে-সব কথা তাঁরা বলে থাকেন, তা শুধু নিজেদেরই উদ্দেশে উচ্চারিত শব্দাবলি নয়, অন্য-অনেকের কাছেও সেই শব্দগুলিকে তাঁরা পৌঁছে দিতে চান, তা হলে কিন্তু গোল এত সহজে মেটে না ; কবিতার কঠিনতা কিংবা দুরূহতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে তার একটা জবাব দেবার দায়িত্ব তখন স্বতই তাঁদের উপরে এসে বর্তায়।

একেবারে গোড়াকার প্রশ্নটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, কবিতাকে নিতান্ত স্বগত-সংলাপ বলে মানা চলে কি না।

মানা খুবই শক্ত। এমন-কী, কবিদের পক্ষেও। বিশেষ করে সেই কবিদের পক্ষে নিজেদের লেখা কবিতা যাঁরা অন্যদের পড়ে শোনান, কিংবা পত্রপত্রিকায় ছাপতে দেন, কিংবা নিজেদের কবিতাকে যাঁরা বই হিসেবে ছাপিয়ে বার করেন।

এ-কথা এইজন্যে বলছি যে, কবিতা যদি নেহাতই কারও নিজের-উদ্দেশে-ব্যক্ত শব্দসমষ্টি হত, তা হলে তো ব্যক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার কাজ ফুরোত, এবং কবিও তাঁর সদ্যোজাত কবিতাটিকে সেক্ষেত্রে বাতাসে উড়িয়ে দিতে, জলে ভাসিয়ে দিতে, আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে কিংবা বাক্স-প্যাঁটরায় বন্দি করে রাখতে কোনও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু সত্যিই কি তা তিনি করেন? মোটেই না। তিনি তাঁর কবিতাকে উড়িয়েও দেন না, ভাসিয়েও দেন না, পুড়িয়েও ফেলেন না, কিংবা বাক্স-প্যাঁটরায় বন্দি করেও রাখেন না। তার বদলে তিনি সেটিকে ছাপতে দেন।

কেন ছাপতে দেন? কারণটা নিশ্চয় এই যে, আরও অনেকের কাছে তাঁর কবিতাকে তিনি পৌঁছে দিতে চাইছেন। হতে পারে, কবিতাটি তিনি তাঁর নিজেরই জন্য রচনা করেছিলেন, তার কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর নিজেরই উদ্দেশে; কিন্তু এখন—যখন তিনি তাঁর কবিতাটিকে সর্বসমক্ষে পাঠাচ্ছেন, তখন—আমরা ধরেই নিতে পারি যে, নিজের কথা শুধু নিজেকে শুনিয়েই তিনি খুশি থাকতে পারছেন না, তিনি চাইছেন যে, সেই কথাগুলি অন্যেরাও শুনুক।

অর্থাৎ কবিতা তা হলে আর নিতান্ত আত্মকথন কিংবা স্বগতোক্তির ব্যাপার নয়, একইসঙ্গে সেটা অন্যের সঙ্গে কথা বলবার ব্যাপারও বটে।

কিন্তু তা-ই যদি হয়, তো খুব জরুরি একটা প্রশ্নের সম্মুখীন না-হয়ে আমাদের উপায় থাকে না। প্রশ্নটা এই যে, এমন কোনও ভাষায় কি কারও সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি, যার অর্থ বুঝতে গিয়ে তাঁর গলদ্‌ঘর্ম হবার সম্ভাবনা?

না, তা আমরা পারি না। তা আমরা বলিও না। আমরা খুব ভালই জানি যে, কারও সঙ্গে কথা বলবার কতকগুলো শর্ত আছে। এ-ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে জরুরি শর্ত, সেটা এই যে, সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে, শ্রোতার পক্ষে যা বোধগম্য। শর্তটা, বলা বাহুল্য, আমরা পালনও করে থাকি।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষা। শৈশব থেকে আমরা বাংলা বলছি, সুতরাং এই ভাষায় কথা বলতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। ধরা যাক, হিন্দিটাও আমরা জানি, কিন্তু সে-জানা নেহাতই অল্পস্বল্প, বাংলায় যত সহজে আমাদের মনোভাব আমরা ব্যক্ত করতে পারি, হিন্দিতে তত সহজে পারি না। তবু, এমন কারও সঙ্গে যখন আমাদের কথা বলবার দরকার ঘটে, যিনি হিন্দি

ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও ভাষারই বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না, তখন—হিন্দি ভাষাটা তত ভালভাবে না-জানা সত্ত্বেও—হিন্দিরই শরণ আমাদের নিতে হয়। ঠিক সেইরকম, ইংরেজিতে আমাদের দখল যেক্ষেত্রে পাকাপোক্ত নয়, সে-ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, আদৌ বাংলা-না-জানা কোনও ইঙ্গভাষীর সঙ্গে কথা বলবার দরকার হলে, যতই অসুবিধে হোক, ইংরেজিরই শরণ আমরা নিয়ে থাকি।

শেক্সপিয়ারের নাটকের সেই দৃশ্যটির কথা মনে পড়ছে, পরস্পরের ভাষা না-বোঝার দরুন ইংরেজ রাজা ও ফরাসি রাজকুমারীর মধ্যে যেখানে হৃদয়-বিনিময়ের পর্বটা ঠিক জমে উঠতে পারছিল না। দোভাষীর মারফতে নয়, ফরাসিভাষিণী ক্যাথারিনের নিজের মুখেই ভালবাসার কথা শুনতে চান ফরাসি-না-জানা হেনরি, কিন্তু তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে ক্যাথারিন বলছেন, 'আই কান্ট স্পিক ইয়োর ইংল্যান্ড।'[১] এই উক্তিই অবশ্য ফাঁসিয়ে দিল ক্যাথারিনকে। হেনরি বুঝলেন, ক্যাথারিন যে আদৌ ইংরেজি জানেন না, তা নয়, ভাঙা-ভাঙা জানেন, এবং সেই ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতেই শ্রোতার কাছে তাঁর ভালবাসার কথাটা পৌঁছে দিতে পারেন তিনি। বেশ তো, তা হলে তা-ই করুন। অশুদ্ধ, খঞ্জ ইংরেজিতেই তাঁর বিশুদ্ধ ও সমর্থ ভালবাসার কথাটা তিনি জানিয়ে দিন। '...আই উইল বি গ্ল্যাড টু হিয়ার য়ু কনফেস ইট ব্রোকেনলি উইথ ইয়োর ইংলিশ টাং।'[২]

তা এই হচ্ছে ব্যাপার। একজন যখন আর-একজনকে কিছু বলছেন, তখন এমন ভাষায় সেটা বলতে হবে, শ্রোতা যা শুনে বুঝতে পারেন যে, বক্তব্যটা কী। ভাষাটা ভাঙা-ভাঙা হলেও চলবে, শুধু শ্রোতার সেটা বোঝাই চাই। ফলত, কবিতার ভাষা যখন কঠিন ঠেকে, পাঠক তখন স্বতই সিদ্ধান্ত করেন যে, কথা বলবার এই প্রধান শর্তটাই এক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে না।

শুনে কবি নিশ্চয় বিস্ময়প্রকাশ করবেন। বলবেন, 'এর মধ্যে আবার হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি সব ভাষার কথা উঠছে কেন? আমার ভাষা কি আমার পাঠকের ভাষার থেকে আলাদা? আমি তো আমার পাঠকের ভাষাতেই কথা বলছি, সেই ভাষাতেই তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমার বক্তব্য। তবু যদি আমার কবিতার ভাষা তার কাছে কঠিন ঠেকে, তবে তো বুঝতেই হবে যে, নিজের মাতৃভাষাটাও সে জানে না।'

১. 'King Henry the Fifth', Act 5, Scene 2.

২. 'King Henry the Fifth', Act 5, Scene 2.

কিন্তু সত্যিই কি তাই? নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি লক্ষ করুন :

১. নরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে...[৩]

২. কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী।[৪]

কবিতার ভাষা এখানে বাংলা। এর পাঠকও বঙ্গভাষী। কিন্তু আপন ভাষায় তাঁর মোটামুটি দখল থাকলেই যে এই পঙ্‌ক্তিগুলির বক্তব্য সেই পাঠকের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যাবে, তাও নয়।

কেন পৌঁছয় না?

সমস্যাটা কি তা হলে এই যে, পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ভাষা আছে, তেমনি আবার বিভিন্ন ভাষার আপন এলাকার মধ্যেও রয়েছে একাধিক স্তর? এটাকে সমস্যা বলছি, কেননা, ভাষার বিভিন্নতার মতো, স্তরের বিভিন্নতাও অনেক সময় অর্থোপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাম ও শ্যামের ভাষা একই হতে পারে, কিন্তু শুধু এই কারণেই যে রামের যাবতীয় কথা শ্যামের হৃদয়ঙ্গম হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে, না-ও হতে পারে। হলে বুঝতে হবে, রাম এক্ষেত্রে সেই স্তরের ভাষা ব্যবহার করেছিল, যে-স্তর শ্যামেরও অনধিগম্য নয়।

বস্তুত, কারও সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের ঠিক করে নিতেই হয় যে, কোন্ স্তরের ভাষা ব্যবহার করলে সে খুব দ্রুত তার অর্থটাকে ধরতে পারবে। আমরা বললুম বটে 'ঠিক করে নিতে হয়', কিন্তু স্তর-বিষয়ক এই যে সিদ্ধান্ত, এর পিছনে আমাদের সজ্ঞান প্রয়াস থাকে কি না, সেটা সন্দেহের ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। বরং প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেখানে যে-স্তরের ভাষা ব্যবহার করলে শ্রোতার পক্ষে আমাদের বক্তব্য উপলব্ধি করবার সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেখানে—যেন-বা নিজেরই অজান্তে—ঠিক সেই স্তরটাই আমরা নির্বাচন করে নিয়েছি। লক্ষ করলেই ধরা পড়বে, একজন অধ্যাপক তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে ভাষার যে-স্তরে বিচরণ করেন, বাজারে গিয়ে সবজিওয়ালার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে ঠিক সেই স্তরে তিনি বিচরণ করেন না। আবার, বাজার থেকে বাড়িতে ফিরে যখন শিশুপুত্রের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর ভাষার স্তর তখন পুনশ্চ পালটে যায়। (ভঙ্গি আর উচ্চারণও পালটায় বই

৩. 'মেঘনাদবধ কাব্য', দ্বিতীয় সর্গ। মধুসূদন।

৪. কঞ্চুকী, 'সংবর্ত'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

কী। যে-শিশুর মুখে ভাল করে বোল ফোটেনি, তার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে অনেকেরই উচ্চারণে যে একটা 'লিসপিং'-এর ভাব এসে যায়, এটা লক্ষণীয়।)

সেই পাদরি-সাহেবের গল্পটা তো সকলেই জানেন। খেয়ানৌকার মাঝিকে তিনি বলেছিলেন, "ওহে কর্ণধার, দ্রুত তোমার তরণী তীরে আনয়ন করো।" মাঝি যে তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারেনি, এ-কথা শুনে সাহেব নাকি বড় বিস্ময়বোধ করেন। "সে কী, মাঝি তো বাঙালি, আর আমিও তো বাংলাভাষাই বলছি, তবে আর ওর না-বুঝবার কারণ কী?" কারণ, বলা বাহুল্য, স্তর-বিভ্রাট। পাদরি-সাহেব যে-স্তরের বঙ্গভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সে-স্তর, আর-যারই হোক, খেয়াঘাটের মাঝির অধিগম্য নয়।

বিভ্রাট ঘটে কবিতার ক্ষেত্রেও। কবি অনেক সময় সেই স্তরের ভাষা ব্যবহার করেন, যে-স্তরে অনায়াস-বিচরণের প্রস্তুতি তাঁর অনেক পাঠকেরই নেই। 'সূর্য' বললে যে-পাঠক ব্যাপারটা তক্ষুনি বুঝতে পারেন, 'ত্বিষাম্পতি' বললে তাঁর হয়তো অসুবিধে হয়। 'প্রহরী' বললে যে-পাঠক অর্থটা তক্ষুনি ধরতে পারেন, 'কঞ্চুকী' বললে তাঁর বিড়ম্বনার হয়তো অবধি থাকে না।

এই যে অসুবিধে, এ হল নেহাতই শব্দার্থ না-জানার অসুবিধে। কবি পৌঁছতে চান তাঁর পাঠকের কাছে। কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দের অর্থ যেহেতু পাঠকের জানা নেই, তাই পাঠকের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেন না। দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। মাইকেল ও বাঙালি পাঠকের মধ্যে এই ব্যবধান ছিল, আছে সুধীন্দ্রনাথ ও বাঙালি পাঠকের মধ্যেও। এমন পাঠক একালে অনেক দেখি, যাঁরা কবিতা পড়তে ভালবাসেন, এবং কবিতার ভিতর থেকেই নিষ্কাশন করে নিতে চান তাঁদের আনন্দের সমর্থন ও শোকের সান্ত্বনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, বড্ড দুরূহ। তাঁরা শুনেছেন যে, সুধীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের যে-রাজ্যপাট, নেহাতই শব্দগত দুরূহতার কারণে সেখানে তাঁরা ঢুকতে পারেননি।

ঢোকা নাকি সম্ভব হত, যদি আর-একটু সহজ সরল শব্দ দিয়ে তাঁর কবিতা গড়তেন সুধীন্দ্রনাথ ; ব্যবহার করতেন শুধু সেইসব শব্দ, যার একটাও তাঁদের অচেনা নয়। একটু আগেই আমরা সুধীন্দ্রনাথের যে-দুটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেছি, আলোচনার সুবিধের জন্য তারই উপরে আর-একবার চোখ রাখা যাক :

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী।

কী বলবেন এই পঙ্‌ক্তি দুটি সম্পর্কে একজন সাধারণ বাঙালি পাঠক? 'কঞ্চুকী' শব্দটার অর্থ তাঁকে জানিয়ে দেবার পরে হয়তো এই কথাই তিনি বলবেন যে, 'কঞ্চুকী'র বদলে যদি 'প্রহরী' শব্দটি ব্যবহৃত হত, অনেক পাঠকেরই তা হলে হয়তো অস্বস্তিবোধের কোনও কারণ ঘটত না।

কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? একে তো 'কঞ্চুকী' শব্দটিকে বর্জন করলে এক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের দাবি মেটে না, তার উপরে আবার এমনও সম্ভব যে, ধ্বনির প্রয়োজনে (কবিতার যে-প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা সবাই স্বীকার করে থাকেন) কবি এক্ষেত্রে, অন্য-কোনও শব্দ নয়, 'কঞ্চুকী'কেই চাইছিলেন। আর তা ছাড়া, 'কঞ্চুকী' ও 'প্রহরী' যে একেবারে ষোলো-আনা সমার্থক শব্দ, তাও নয়। কবি তা হলে কী করবেন? তিনি কি অন্ত্যমিলের দাবি মেটাবেন না, ধ্বনির গুরুত্ব স্বীকার করবেন না, এবং অর্থের বিচারেও যেটি যথাশব্দ, পাঠকের অসুবিধার কথা ভেবে তাকে বর্জন করবেন? তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, তাই তিনি করলেন ; অন্ত্যমিলের ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়ে, ধ্বনির প্রয়োজনকে প্রাধান্য না দিয়ে, এবং অর্থের বিচ্যুতি সম্পর্কেও নির্বাক থেকে গিয়ে 'কঞ্চুকী'র বদলে 'প্রহরী'কেই স্থান করে দিলেন ওই কবিতায়। কিন্তু, হায়, তাতেও সমস্যা মেটে না, তারও পরে থেকে যায় একটি প্রশ্ন। সেটা এই যে, 'কঞ্চুকী'র বদলে 'প্রহরী' শব্দটি ব্যবহার করলেই যে সর্বজনের সুবিধে ঘটবে, এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়? 'কঞ্চুকী'র অর্থ যাঁরা জানেন, তাঁদের তুলনায় হয়তো আরও বেশিসংখ্যক পাঠক জানেন 'প্রহরী'র অর্থ, কিন্তু তাঁদের পরেও থেকে যেতে পারেন, থেকে যান, এমন আরও অসংখ্য পাঠক, 'প্রহরী' শব্দটারও অর্থ যাঁদের জানা নেই।

তাঁদের কী হবে? তাঁদের সমস্যাটাকে মেটাবার জন্যে কবি কি তা হলে ভাষার আরও নীচের স্তরে নেমে আসবেন, এবং 'প্রহরী'কেও বিদায় দিয়ে ডেকে আনবেন সর্বজনগ্রাহ্য 'পাহারাদার'কে? এমন হাস্যকর প্রস্তাবকে নিশ্চয় প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অন্যদিকে, শব্দার্থ জানলেই যে সকল পাঠকের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তাও কিন্তু নয়, একই সঙ্গে তাঁকে বুঝে নিতে হয় অনুষঙ্গের তাৎপর্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার যে পঙ্‌ক্তিটিতে ওই 'কঞ্চুকী' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে, সেই একই পঙ্‌ক্তিতে আমরা পাচ্ছি 'কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে'—এই বাগ্‌বন্ধটিকে। শব্দ দুটির একটিও আমাদের অচেনা নয় ; কিন্তু কথা হচ্ছে, 'কামাখ্যা' বলতে এখানে কাকে বুঝব আমরা? দেবীকে, না পীঠস্থানকে? এবং

ষড়যন্ত্রটাই বা কিসের? কবি কি এখানে একটা জরুরি সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের? 'কঞ্চুকী'র ভূমিকাতেও যে তিনি কতটা অসহায়, কিংবা দায়িত্ব পালনে কতটা অক্ষম, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই কি আভাস দিচ্ছেন কোনও পৌরাণিক গল্প কিংবা কিংবদন্তীর? বলা বাহুল্য এ-সব প্রশ্নের উত্তরও আমাদের জানা চাই। কেননা, তা না-জানা পর্যন্ত, শব্দার্থ জানা-সত্ত্বেও, গোটা ব্যাপারটাই আমাদের কাছে একটা প্রহেলিকার মতন ঠেকতে থাকে, এবং কবিতার মর্মস্থলে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নিতান্ত শব্দার্থ অবশ্য সহজেই জেনে নেওয়া যায়। হাতের কাছে একটা শব্দকোষ থাকলেই তার পাতা উলটে চটপট আমরা জেনে নিতে পারি যে, 'কঞ্চুকী' শব্দের অর্থ কী। কিন্তু মজা এই যে, এইটুকু কষ্টও স্বীকার করতে চান না অনেক পাঠক ; এমন-কী, কবিতাপাঠের সঙ্গে যে শব্দকোষের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে, এটাই তাঁরা মানতে চান না। তাঁদের বক্তব্য, অন্য কারও কবিতা বুঝবার জন্য যখন শব্দকোষের সাহায্য নিতে হচ্ছে না, তখন সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই বা হবে কেন?

কার ক্ষেত্রে হয় না?

মাইকেলের ক্ষেত্রে যে হয়, এই আলোচনায় উদ্ধৃত তাঁর কবিতার 'ত্বিষাম্পতি'-শব্দটাই তো তার প্রমাণ দিচ্ছে। এমন অসংখ্য অপরিচিত, অপ্রচলিত এবং জোর-করে-বানিয়ে-তোলা শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়, বিষয়গত গাম্ভীর্যের কারণে কিংবা প্রার্থিত ধ্বনির স্বার্থে যেগুলি হয়তো তিনি অকুণ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু শব্দকোষের সাহায্য না নিলে যাদের অর্থ উপলব্ধির কোনও আশাই আমাদের নেই।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ? হায়, তাঁর কবিতা বুঝতে হলেও—অন্তত একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে—শব্দকোষের সাহায্য না-নিয়ে উপায় থাকে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা'[৫]—রবীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তিটিতে

৫. বর্ষামঙ্গল, 'কল্পনা'। 'রসনা' শব্দের দুই অর্থ। জিহ্বা ও কটিভূষণ। বিকল্প বানান 'রশনা'। প্রথম বানানই অবশ্য বেশি প্রচলিত। সম্ভবত সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ যখন কটিভূষণ বোঝাতে চান, জিহ্বার সঙ্গে পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য রবীন্দ্ররচনাবলীতে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) এই কবিতায় তখন 'রশনা' বানান গ্রাহ্য হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'য় (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৫৩) কিন্তু কটিভূষণ-অর্থেও 'রসনা' বানানই আমরা দেখতে পাই।

'রসনা'-শব্দের অর্থ যে মোটেই জিহ্বা নয়, এক ধরনের অলঙ্কার (যা কিনা এ-দেশের রমণীরা এককালে কটিদেশে ধারণ করতেন), শব্দকোষের সাহায্য না-নিলে সে-কথা আমরা বুঝব কী করে? অথবা কী করেই বা জানব যে, বনভূমির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যখন বলেন, 'কানন পরেছে শ্যামল দুকুল'[৬]—তখন 'দুকুল' বলতে তিনি পট্টবস্ত্র বা ক্ষৌমবস্ত্রের কথা বোঝাচ্ছেন? জানলে কিন্তু তাঁর কবিতার মর্মগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ হয়; আর কিছু না হোক, সালঙ্কারা ওই নর্তকী ও বসন্তকালের ওই সবুজ বনভূমির (যাকে দেখে সবুজ-রঙের-পট্টবস্ত্র-পরিহিতা বনদেবী বলেই ভ্রম হয়) ছবিটি আমাদের মনশ্চক্ষে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শব্দকোষের সাহায্য অতএব নেওয়াই ভাল। সুধীন্দ্রনাথের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু অন্তত এই পরামর্শই দিচ্ছেন। বলছেন, "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন; তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হল একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে, আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনও শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না।"[৭]

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথকেই বা আলাদা করে চিহ্নিত করা কেন? সাধারণ্যে অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করার প্রবণতা তো আরও অনেক কবির মধ্যেই দেখতে পাই আমরা। হতে পারে যে, সেকালে যেমন মাইকেল, একালে তেমন সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই সেই প্রবণতা ছিল অতিমাত্রিক; কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রেও যে শব্দকোষের সাহায্য নেবার দরকারটা—প্রায়শ না হোক—মাঝে-মাঝে খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, তাতেও সন্দেহ নেই। এবং সাহায্যটা নিলে যে শুধু শব্দ-প্রয়োগের নির্ভুলতা ও যাথার্থ্য দেখেই মুগ্ধ কিংবা পুলকিত হই আমরা, তাও নয়। সত্যি বলতে কী, কবিতার পাঠকের পক্ষে সেটাই যে একটা মস্ত প্রাপ্তি, তাও আমাদের মনে হয় না। আসলে, শব্দকোষের পাতা ওলটাবার যে পরিশ্রম, সেটুকু স্বীকার করে নেবার ফলেই কঠিন শব্দের দরজা খুলে তাঁদের কবিতার

৬. "প্রেম" পর্যায়ের গান, 'গীতবিতান' (প্রথম পঙ্‌ক্তি : কাহার গলায় পরাবি...)
৭. ভূমিকা, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'

ভিতরমহলে প্রবেশ করা আরও সহজ হয় আমাদের পক্ষে, এবং সেটাই সেই পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গের তাৎপর্য বুঝে নেবার ব্যাপারে অবশ্য স্বদেশি বিদেশি কোনও অভিধানই বিশেষ সাহায্য করে না আমাদের। বিষ্ণু দে'র কবিতায় আমরা যখন পড়ি, 'বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়',[৮] তখন লেমপ্রায়ারের পৌরাণিক অভিধান মাত্র এইটুকুই জানিয়ে দেয় আমাদের যে, কাসাণ্ড্রা ছিলেন অ্যাপোলোর প্রণয়িনী, কিন্তু—সেই প্রণয়ের সূত্রে—নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি অ্যাপোলোকে প্রদত্ত তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেননি, তাই তাঁর উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। অভিধান এর বেশি কিছু আমাদের বলে না! কী করবেন তা হলে কৌতূহলী পাঠক? তাঁর তো জানতে ইচ্ছে করবে যে, কাসাণ্ড্রার কথা এখানে উঠছে কেন, এবং দুর্যোগটাই বা কিসের। বস্তুত, সেটা না-জানা পর্যন্ত এই কবিতার নেপথ্যবর্তী প্ররোচনার খবর যেমন তিনি পাবেন না, তেমনি এর লক্ষ্য অথবা অভিপ্রায়ের খবরও তাঁর অজ্ঞাত থেকে যাবে।

কৌতূহল নিরসনের উপায় তা হলে কী? একমাত্র উপায় নিজের জানার পরিধিকে নিজের চেষ্টায় আরও বাড়িয়ে নেওয়া। মানবিক নানা উদ্যম ও যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম, সংকট ও বিপর্যয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আর-একটু অবহিত হওয়া। এটা এইজন্যই জরুরি যে, দেশকাল সম্পর্কে একেবারে অনবহিত থেকে গেলে, যেমন বিষ্ণু দে'র এই কবিতা, তেমনি স্বদেশ ও বিদেশের আরও অনেক কবিরই অনেক জরুরি কবিতাকেও তার নিজস্ব পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সন্দেহ নেই যে, পাঠককে আরও পরিশ্রমী হতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ একদা এই রকমের একটি কথা বলেছিলেন যে, কবিতার দুরূহতার মূলে রয়েছে পাঠকের আলস্য। তিনি খুব ভুল বলেননি।

২

যে-দুরূহতা শব্দগত, আলস্য পরিহার করলেই তার কপাটগুলিকে আমরা খুলে ফেলতে পারি। একটু পরিশ্রমী হলেই বুঝতে পারি স্বদেশি-বিদেশি নানা নামোল্লেখের তাৎপর্য। সেইসঙ্গে, যেটা আমাদের চেনা-জানার এলাকা, তার

৮. কাসাণ্ড্রা, 'সন্দীপের চর'।

সীমানাকে যদি আমরা আর-কিছুটা বাড়িয়ে নিই, নানা অনুষঙ্গের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারও তা হলে আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হয় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে প্রযত্ন কিংবা পরিশ্রম, এরই পরিণামে কি আমরা কবিতার—সর্ব রকমের কবিতার—হৃৎপ্রদেশে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পেয়ে যাব? কিছু কবিতার ক্ষেত্রে যে পাব, তাতে সন্দেহ নেই। সেই ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে পাব, শব্দ কিংবা অনুষঙ্গের অর্গল মুক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যার দুরূহতারও অবসান ঘটে। কবিতার অর্থানুধাবন সে-ক্ষেত্রে যেন চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলবার মতোই একটা ব্যাপার। তালা যখন খুলে যায়, কবিতার অবগুণ্ঠনও তখন খসে পড়ে, আর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যা লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ, নিমেষে আমরা তার সামীপ্যে এসে দাঁড়াই। কবিতা ও তার পাঠকের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তখন আর থাকে না।

সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা, বস্তুত, এই ধরনের কবিতা। আবেগবর্জিত না হয়েও তাঁর কবিতা যেহেতু ধোঁয়াটে ভাবালুতাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, বরং যুক্তির পারস্পর্য সমূহ রক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে চেয়েছে, তাই তাঁর ব্যবহৃত নানা শব্দের অর্থ আর নানা অনুষঙ্গের তাৎপর্য যখন আমরা জেনে নিই, তাঁর অনেক কবিতাই তখন আর আমাদের কাছে তেমন কঠিন ঠেকে না, এবং তাঁর চিন্তার প্রবাহকে অনুসরণ করাও আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু এরই অন্যদিকে রয়েছে আর-এক ধরনের কবিতা। সেও কঠিন কবিতাই, তবে তার কঠিনতার প্রকৃতি একেবারে অন্যরকম। নিতান্ত শব্দ অথবা স্বদেশি-বিদেশি নানা নাম, ঘটনা আর অনুষঙ্গের কারণে নয়, আরও গভীর ও মৌলিক কারণে তার অর্থ অনুধাবন আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। যে-সব শব্দ দিয়ে গড়া হয়েছে তার শরীর, প্রায়ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, তার প্রতিটিই আমাদের চেনা-জানা, বস্তুত আমরা নিজেরাই সে-সব শব্দ নিয়ত ব্যবহার করে থাকি, উপরন্তু এমন কোনও নাম কিংবা অনুষঙ্গ সেখানে আমাদের চোখে পড়ে না, কারও কাছেই যা কিনা ধাঁধার মতো ঠেকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মর্মগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না ; বারংবার সেই কবিতা পাঠ করেও আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে, কবি সেখানে ঠিক কী বলতে কিংবা কিসের আভাস দিতে চাইছেন।

নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

> বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
> ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে :
> হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
> সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
> সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর...[৯]

জীবনানন্দের কবিতা থেকে তুলে আনা এই লাইনগুলির মধ্যে এমন একটিও শব্দ নেই, যার অর্থ আমরা জানি না কিংবা যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কথাবার্তায় কদাচ ব্যবহৃত হয় না। অথচ লক্ষ করবার বিষয় এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত, এবং প্রত্যেকের দ্বারাই প্রায়শ ব্যবহৃত, অত্যন্ত আটপৌরে কিছু শব্দের সমাহারও এক্ষেত্রে এমন এক অবগুণ্ঠন রচনা করেছে, আমাদের দৃষ্টি যাকে ভেদ করতে পারে না, এবং আমাদের বুদ্ধি যাতে প্রতিহত হয়। বারবার আমরা চেষ্টা করি সেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তী অর্থের আভাস পেতে, এবং বারবার আমরা ব্যর্থ হই।

টেনেবুনে এই লাইনগুলির একটা অর্থ যে আমরা দাঁড় করাতে পারি না, তা অবশ্য নয়। প্রথম দুটি লাইন পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে, নিতান্ত ব্যক্তিজীবন নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার পটভূমিকায় স্থাপনা করে সেই চরম দিনান্তের কথা এখানে বলা হচ্ছে, পিছনে তাকালে অসমাপ্ত নানা কাজের সঙ্গে-সঙ্গে নানা উল্লেখযোগ্য মানবিক কৃতিও যখন আমাদের চোখে পড়ে। তৃতীয় লাইনে এসে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এটা হয়তো সেই অবস্থার দৃষ্টান্ত, আক্রমণকারী ও আক্রান্তের ভূমিকা যেখানে পালটে যায়। এবং শেষ দুটি লাইন পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে 'সম্রাট' বলতে কবি আসলে সেই নিয়তির কথাই বুঝিয়েছেন, সাধারণ মানুষ যার হাতে নিতান্ত ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়। তা নইলে আর কঙ্কাল থেকে সৈনিক হয়ে পুনশ্চ তাকে কঙ্কাল হতে হয় কেন? কিন্তু 'কঙ্কাল' শব্দটাকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার সময় কবি যে কেন তার আগে 'সচ্ছল' বিশেষণটিকে বসিয়ে দেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের অতৃপ্তিরও তাই অবসান ঘটে না। আমরা বুঝতে পারি যে, লাইনগুলির

৯. সৃষ্টির তীরে, 'সাতটি তারার তিমির'। জীবনানন্দ দাশ

যে-অর্থ আমরা দাঁড় করিয়েছি, তা নেহাতই কষ্ট-কল্পিত, এবং বানিয়ে-তোলা সেই অর্থের মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর থেকে যাচ্ছে।

এই যে ফাঁক-ফোকর, এগুলি থেকেই যাবে। অন্তত ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ না কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আমরা মিলিয়ে নিতে পারব। মিলিয়ে নেওয়া কেন সম্ভব হয় না, সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে বরং আর-একটা কথা বলে নিই।

ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি যে, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। জীবনানন্দের এই যে মন্তব্য, জানতে আমাদের কৌতূহল হয় যে, এর অর্থটা ঠিক কী। তিনি কি কবি ও পদ্যকারদের দুই পৃথক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে দেখাতে চান? নাকি, শুধুই পদ্যকার নয়, সর্বজনের থেকে আলাদা করে দেখাতে চান কবিদের? কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য যা-ই হোক, স্পষ্ট একটা সীমারেখা টেনে দিয়ে কবিদের তিনি যে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণীর শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, সেটা বুঝে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না।

এক্ষেত্রে আমাদের বলবার কথাটা এই যে, ঠিক এই ভাবেই নিশ্চয় আরও নানা সীমারেখা টানা যায় কবিসমাজের আপন এলাকার মধ্যেও। বলা যায়, কবিরা অবশ্যই অন্যদের থেকে পৃথক গোত্রের মানুষ, কিন্তু তাঁরা নিজেরাও কিছু একে অন্যের সগোত্র নন। রবীন্দ্রনাথ আর মাইকেল কি একই গোত্রের কবি? কিংবা, ধরা যাক্, জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব? আসল কথা, যাঁদের আমরা কবি বলে জানি, শব্দরুচি, বিষয়বস্তু, বর্ণনারীতি, বাগ্‌ভঙ্গিমা ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যৎপরোনাস্তি বৈষম্য থাকা সম্ভব, এবং সেটা থাকেও।

আপাতত অবশ্য সে-সব ব্যাপারের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না ; শুধু মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে তাঁদের বিভক্ত করে নিয়ে বলতে চাইছি যে, (ক) কিছু কবি যেমন আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের ভিতর থেকেই খুঁজে নেন তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু, তেমন আবার (খ) এমন-কিছু কবিও আমরা দেখতে পাই, যাঁদের দৃষ্টি হয়তো, সর্বদা না হোক, মাঝে-মাঝেই ছাড়িয়ে যায় সেই অভিজ্ঞতার বৃত্তটিকে।

এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিদের নিয়েই আমরা সাধারণত সমস্যায় পড়ি। তাঁদের দৃষ্টি যখন বৃত্তটিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তাঁদের কবিতার বিষয় কিংবা ভাববস্তুকে—সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা তো দূরের কথা—মোটামুটি শনাক্ত করাই আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক। এ-কথা এই জন্য

বলছি যে, কোনও কিছুকে শনাক্ত করতে হলে তার সঙ্গে একটা পূর্ব-পরিচয় থাকার দরকার হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই বিষয় কিংবা ভাববস্তু যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের বহির্ভূত এলাকা থেকে আহৃত, তাই তার সঙ্গে কোনও পূর্ব-পরিচয়ের অবকাশই আমাদের ঘটেনি। ফলত, যা দিয়ে নির্মিত হয়েছে তাঁদের কবিতার শরীর, সেই শব্দগুলিকে আমরা চিনতে পারি বটে, কিন্তু শব্দগুলি যা বলতে চায়, সেই ভাববস্তুকে তার স্বরূপে আমরা চিনে উঠতে পারি না।

প্রশ্ন উঠবে, সমকালীন সাধারণ অভিজ্ঞতার যে বৃত্তের কথা আমরা বলছি, তারই ভিতর থেকে যাঁরা খুঁজে নেন তাঁদের কবিতার বিষয় বা ভাববস্তু, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিদের তুলনায় তাঁদের কবিকৃতির আবেদন অনেক স্বল্পায়ু কি না। অর্থাৎ সমকালীন পাঠকদের তুষ্টিসাধন কিংবা তৃপ্তিবিধান করেই ফুরিয়ে যায় কি না তাঁদের কবিতার আবেদন। এই যে প্রশ্ন, মোটামুটিভাবে এর একটা উত্তর আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। অতীতকালের নানা শ্রেণীর কবিকৃতির উপরে চোখ বুলিয়ে বলতে পারি, ফুরিয়ে যে যাবেই, এমন কোনও কথা নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের কবিতার আবেদন যেমন সমকালীন পাঠকসমাজের গণ্ডিটাকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনি আবার অনেকের কবিতা পারেও।

বস্তুত, যেমন সমকালে তেমনি উত্তরকালেও আদৃত এমন অনেক কবির কথাই আমরা জানি, সমকালীন জনসমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, যন্ত্রণা, স্বপ্ন, কিংবা স্বপ্নভঙ্গকেই যাঁরা একান্তভাবে তাঁদের কবিতার বিষয় কিংবা ভাববস্তু হিসেবে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেকেই তাঁদের কবিতার মধ্যে নিরন্তর ছায়াপাত করতে দিয়েছিলেন আপন কালের সেইসব রাষ্ট্রনৈতিক কিংবা সামাজিক ঘটনাকে, সমকালীন সাধারণ মানুষকে যা হয়তো তখন বিপুলভাবে আন্দোলিত করেছে, কিন্তু উত্তরকালের মানুষদের পক্ষে যার দ্বারা বিশেষ আন্দোলিত হবার কথা নয়। পরবর্তী কালের মানুষরা যে তবু তাঁদের কবিতার দ্বারা অধিকৃত, গ্রস্ত হন, তার একটা বড় কারণ হয়তো এই যে, সেইসব কবিতার মধ্যে নিহিত থেকে যায় তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত আরও গভীর কিছু অর্থ ; এবং সমকালের পাঠকেরা যেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অর্থের নাগাল পেয়েই পরিতৃপ্ত, পরবর্তী কালের পাঠকদের কাছে সেক্ষেত্রে সেই গভীরতর অর্থগুলি ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। ফলে, অনেককাল ধরেই টাটকা থেকে যায় সেইসব কবিতার সুবাস ; অম্লান থেকে যায় তাদের আবেদন। এমন কী, তাদের রেলিভ্যান্স কিংবা প্রাসঙ্গিকতাও সহসা ফুরিয়ে যেতে চায় না। কাল

পালটায়। তার সঙ্গে পালটায় পরিস্থিতি। অথচ নবতর কালের নবতর পরিস্থিতিতেও তাদের প্রয়োগযোগ্যতা যেন একই রকমের অটুট থাকে।

দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিরা, সেক্ষেত্রে, সমকালের সমাদর বড়-একটা পান না। পেলেও নেহাতই মুষ্টিমেয় কিছু পাঠকের কাছে পান। এমন-কিছু পাঠকের কাছে, যাঁদের দৃষ্টি, ঠিক ওই কবিদের মতোই, আরও একটু দূরে নিবদ্ধ। আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদের, দৃষ্টি তো এই খণ্ডকালের গণ্ডির মধ্যেই আটকে থাকে। ফলত, তাঁদের কবিতার কোনও অর্থ খুঁজে না-পেয়ে ঘোর অস্বস্তি বোধ করি আমরা। কখনও মনে হয়, কাব্যরচনার অছিলায় আসলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জব্দ করবার এ এক কিম্ভূত চক্রান্ত ; কখনও মনে হয়, এ আর কিছুই নয়, ভণ্ডামি।

কবিতা রচনার নামে কেউ যে কখনও এই রকমের ভণ্ডামির খেলায় মাতেননি, তা অবশ্য নয়। আবার, অন্যদিকে, কিছু মানুষের দৃষ্টি যে—সাধারণ মানুষের দৃষ্টির তুলনায়—আর-একটু দূরে প্রসারিত হতে পারে, হয়ে থাকে, তা-ই বা কী করে অস্বীকার করব আমরা? কবির দৃষ্টি তো হতেই পারে। তাঁকে তো আমরা ক্রান্তদর্শী বলি ; সুতরাং আমাদের তুলনায় তাঁর চক্ষু যে অনেক দূরে ধাবিত হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

সত্যি বলতে কী, দৃষ্টি যাঁর দূরকালে নিবদ্ধ, সেই কবির কথা যখন আমরা ভাবি, তখন আর-একটা সিদ্ধান্তেও স্বতই পৌঁছতে হয় আমাদের। সেটা এই যে, দৃষ্টি তাঁর দূরে নিবদ্ধ বলেই নিশ্চয় এমন অনেক দৃশ্য কিংবা চিত্রও তাঁর চোখে পড়ছে, যা কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই দৃশ্য আসলে ভবিষ্যতের দৃশ্য।

না, তাঁকে 'জাদুকর' কিংবা 'গনতকার' বলা হচ্ছে না। আমাদের বলবার কথা এখানে শুধু এইটুকুই যে, তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা যেহেতু আমাদের চেয়ে তীব্রতর, এবং তাঁর চিত্ত যেহেতু আমাদের চেয়ে আরও সেনসিটিভ বা সুবেদী, তাই বৃহৎভাবে প্রকট না-হওয়া পর্যন্ত যে-সব লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না, তাও হয়তো অনেকক্ষেত্রে উশকে দেয় কিংবা দীপিত করে তাঁর কল্পনাকে, এবং তারই থেকে তিনি অনুমান করে নেন কোনও দেশ কিংবা জনসমাজের ভবিষ্যৎ। এই যে 'অনুমান'-এর কথা আমরা বলছি, এও আসলে এক ধরনের দেখা-ই, হয়তো আরও সত্য ও সার্থক দেখা, এবং, তাঁর মনশ্চক্ষে যা কিনা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, অনাগত সেই ভবিষ্যতের ছবিটাকেই তিনি হয়তো আভাসিত করেন তাঁর কবিতায়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে অনেককেই

আজকাল মাথা ঘামাতে দেখি। সামাজিক এই আময় নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই এখানে-ওখানে বিস্তর সেমিনার হচ্ছে ; পত্র-পত্রিকায় লেখালিখিও কিছু কম হচ্ছে না। আলোচনা চলছে নির্লিপ্ত সেইসব মানুষকে নিয়ে, শারীরিকভাবে একটা মানবগোষ্ঠী কিংবা পরিবারের মধ্যে উপস্থিত থেকেও যাঁরা সেই গোষ্ঠী কিংবা পরিবারের ভালমন্দের সঙ্গে যুক্ত কিংবা লগ্ন হয়ে নেই। বলা বাহুল্য, এটা একটা মস্ত সমস্যা। কিন্তু—বিনা নোটিসে—হঠাৎ একদিন এই সমস্যাটা যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে প্রাচ্য পৃথিবীতে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, তাও তো নয়। সমস্যাটা নিশ্চয় দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে বিস্তৃত হয়েছে এই সমাজের শরীরে। কিন্তু প্রথম দিকে এতই অস্পষ্ট ছিল এর লক্ষণগুলি যে, ভাল করে সেগুলি আমাদের চোখেই পড়েনি।

সেটাই স্বাভাবিক। আমরা সাধারণ মানুষ ; রোগের লক্ষণ যতক্ষণ না ব্যাপক হয়ে, প্রকট হয়ে দেখা দেয়, ততক্ষণ তা আমাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু কবির চিত্ত তো আমাদের চেয়ে আরও সুবেদী। তাই তাঁর চোখে পড়ে। এক্ষেত্রেও পড়তে পারত। ব্যাধিটা যখন সমাজ-শরীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, তখনই এর একটা ছায়া সঞ্চারিত হতে পারত তাঁর কবিতায়।

হয়নি, এমন কথা কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। তার অন্তর্ভূত "বোধ" কবিতাটি নিশ্চয় আরও বছর কয়েক আগেই লেখা হয়ে থাকবে। সেই কবিতার মধ্যে হঠাৎ এই প্রশ্নটা যখন ঝিলিক মেরে ওঠে :

> সকলের মাঝখানে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে
> আমি একা হতেছি আলাদা ?

অন্তত তখন একটা ধাক্কা আমাদের বুকের মধ্যে লাগেই। প্রায় বিদ্যুচ্চমকের মতোই এই ভাবনাটাও তখন আমাদের চিত্তে এসে উঁকি মেরে যায় যে, আজকের এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, আজ থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগেই একজন কবি হয়তো তাঁর এই পঙ্ক্তিগুলির মধ্যে একে আভাসিত করেছেন। হতে পারে, এটা সেই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, আপন-সময়-থেকে-এগিয়ে-থাকা কোনও শিল্পী কিংবা ভাবুক যার হাত থেকে কখনও পরিত্রাণ পান না। কিন্তু এই পঙ্ক্তিগুলি যখন পড়ি, আরও বৃহৎ একটি পটভূমিকাতেও এই ব্যাপারটাকে তখন আমরা দেখতে পাই। সত্যি বলতে কী, অ্যালিয়েনেশনের ব্যাধিটাকে নিতান্ত এক-মাত্রিক

একটি সমস্যা বলেও তখন আর আমরা ভাবতে পারি না ; আরও অনেক মাত্রা যোজিত হয় তার শরীরে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আজ নাহয় এই পঙ্‌ক্তিগুলির ভিতর থেকে আমরা এই রকমের তাৎপর্য নিষ্কাশন করে নিচ্ছি,—সেক্ষেত্রে, 'ধূসর পাণ্ডুপিলি' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের সাধারণ পাঠকসমাজ এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে অ্যালিয়েনেশনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পেরেছিলেন কি না। যদি না-পেরে থাকেন, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা, অ্যালিয়েনেশনের বীজ তখনও আমাদের সমাজে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল হয়তো, কিন্তু অসুখটা তখনও এত ব্যাপক আকারে দেখা দেয়নি যে, সেটা সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে এবং তাঁদের চিন্তাভাবনায় একটা মস্ত বড় জায়গা জুড়ে বিরাজ করবে। অর্থাৎ সামাজিক যে পটভূমিকায় রেখে এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে আজ আমরা বিচার করে দেখতে পারছি, সাধারণ একজন পাঠকের জীবনে সেই পটভূমিকাটাই তখন ছিল না।

শুধু জীবনানন্দ বলে কথা নেই, এমন আরও অনেক কবিরই নাম করা যায়, শব্দের কিংবা অনুষঙ্গের কোনও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর না-থাকা সত্ত্বেও সমকালীন সাধারণ পাঠকসমাজ যাঁদের, সব কবিতার না হোক, অনেক কবিতারই অর্থ ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি, অথচ পরবর্তী কালের পাঠকসমাজের কাছে যাঁদের সেইসব কবিতার অর্থ ধীরে-ধীরে পরতে-পরতে উন্মোচিত হয়েছে, এবং আরও অনেক কাল ধরেই হয়তো হতে থাকবে।

ব্যতিক্রম নন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর এমন অনেক কবিতার কথাই তো আমরা জানি, সেকালের অনেক ধুরন্ধর সমালোচকও যার সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, অথচ একালের অনেক সাধারণ পাঠকের পক্ষেও যা থেকে কিছু-না-কিছু অর্থ এবং প্রচুর আনন্দ নিষ্কাশন করতে এমন-কিছু অসুবিধে হয় না। তাই বলে তাঁর সমস্ত কবিতারই সবটুকু অর্থ যে ইতিমধ্যে আমরা ধরতে পেরেছি, তাও হয়তো নয়। বরং সন্দেহ হয় যে, এমন কবিতাও অনেক লিখেছেন তিনি, যার মাত্র উপরকার স্তরের অর্থ হয়তো আমরা উপলব্ধি করেছি, কিন্তু তার অন্তরালেও হয়ে গিয়েছে আরও নানা স্তর, আরও নানা অর্থ। সেই অর্থগুলি হয়তো পরে কখনও ধরা পড়বে। হয়তো দেখা যাবে, প্রণয়-বিদ্বেষ-লোভ-বৈরাগ্য-আগ্রহ-অনাসক্তি-সাফল্য-ব্যর্থতা সংবলিত এই যে জীবন আমরা যাপন করি, এরই সম্পর্কে অর্থবহ নানা ইঙ্গিত, নানা সংকেত নিহিত রয়েছে সেই কবিতায়। সেই ইঙ্গিত ও সংকেতের তাৎপর্য বুঝলে হয়তো আমরাই সবচেয়ে

উপকৃত হতুম। কিন্তু আমরা বুঝিনি। কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিতে পারিনি আমরা।

কী বলব তা হলে আমরা কবিকে? আমরা কি বলব যে, যাতে তাঁর কবিতার মর্মগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার জন্যে তাঁর দৃষ্টিকে আমাদের এই খণ্ডকালের মধ্যেই তিনি আবদ্ধ রাখুন? এবং আমাদের অভিজ্ঞতার স্তরে যেটুকু ধরা পড়েছে, ছন্দে বেঁধে শুধু তারই কথা তিনি আমাদের শুনিয়ে যান?

বললেই যে তিনি তা করবেন, তা নয়। কিন্তু করলে যে তাতে আমাদেরই ক্ষতি, তা-ই বা আমরা বুঝব না কেন? আমরা কেন এই সহজ সত্যটা কখনও উপলব্ধি করব না যে, এই ধরনের কবিদের ভূমিকা অনেকটা অগ্রবর্তী সৈনিকের মতো। আমাদের থেকে তাঁরা এগিয়ে রয়েছেন, এবং লক্ষ রাখছেন সেই পথের উপরে, যে-পথ দিয়ে গোটা সমাজ একদিন এগোবে।

আমরা তাঁদের পিছিয়ে আসতে বলব কেন? আমাদেরই উদ্দেশে দূর থেকে যে-ইঙ্গিত, যে-সংকেত তাঁরা পাঠাচ্ছেন, আমরা বরং তার তাৎপর্যকে, যতটা সম্ভব, বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

কবিতার যাঁরা সৎ পাঠক, সেই চেষ্টায় কখনও তাঁরা ক্লান্তি মানেন না।